নির্বাচনের পথে নয়

একমাত্র সমাজবিপ্লবের পথেই শোষণমুক্তি সম্ভব

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

নির্বাচনের পথে নয় — একমাত্র সমাজবিপ্লবের পথেই শোষণমুক্তি সম্ভব
— প্রভাস ঘোষ
(৫ আগস্ট, ২০১৮-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১০ অক্টোবর, ২০১৮

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ আট টাকা

প্রকাশকের কথা

২০১৮ সালের ৫ আগস্ট বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ-এর স্মরণদিবস উপলক্ষে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতার রানী রাসমণি এ্যাভিনিয়্যুতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর সময়োপযোগী মূল্যবান বক্তব্য ইতিমধ্যে পার্টির বাংলা মুখপত্র গণদাবী-র ৭১ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় এরং ইংরাজী অনুবাদ প্রোলেটারিয়ান এরা-র ৫২ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচনাটির গুরুত্ব অনুভব করে বর্তমানে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হল। প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ সামান্য সংযোজন করেছেন।

১০ অক্টোবর, ২০১৮ **মানিক মুখার্জী**

কলকাতা

নির্বাচনের পথে নয়
একমাত্র সমাজবিপ্লবের পথেই শোষণমুক্তি সম্ভব— কমরেড প্রভাস ঘোষ

৫ আগস্ট দিনটি আমরা গভীর বেদনামিশ্রিত আবেগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে উদযাপন করে যাচ্ছি। এবপরেও বছরে বছরে ৫ আগস্ট আসবে, আমরা সেদিন থাকব না। আপনারাও অনেকে থাকবেন না। এ দেশের মুক্তিকামী জনসাধারণ গভীর শ্রদ্ধার সাথে সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের এই স্মরণ দিবস উদযাপন করবে, তাঁর অমূল্য শিক্ষাগুলোকে স্মরণ করবে এবং সেই শিক্ষার ভিত্তিতে তাদের সামনে যা কর্তব্য সেটা নির্ধারণ করবে। গত কয়েক দিন ধরে এবং আজও অবিশ্রান্ত বৃষ্টিজনিত গভীর দুর্যোগের মধ্যে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনারা পশ্চিমবাংলার দূরদূরান্তের গ্রাম শহর বিভিন্ন এলাকা থেকে আজকের এই সমাবেশে সামিল হয়েছেন। আমি মূলত চেষ্টা করব সমসাময়িক কিছু সমস্যা সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের বক্তব্য আপনাদের সামনে আলোচনা করতে।

আপনারা দেখছেন, ইতিমধ্যেই সারা দেশে নির্বাচনের বাজনা বেজে উঠেছে। বড় মাঝাবি ছোট দল— বিজেপি, কংগ্রেস, আরজেডি, বিএসপি, এসপি, ডিএমকে, এডিএমকে, জেডিইউ, অকালি দল, শিবসেনা, এ রাজ্যে তৃণমূল— সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই নির্বাচনে কে ক'টা আসন লাভ করবে তার হিসাব-নিকাশের জন্য। সকলেই প্রস্তুতি নিচ্ছে জনগণকে কোন কথা বলে, কীভাবে ঠকিয়ে এই নির্বাচনে তারা বাজিমাত করতে পারে। অন্যদিকে শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, কালোবাজারি, মুনাফাখোরদের সাথেও গোপনে আলোচনা চালাচ্ছে কার কাছ থেকে কত কোটি টাকা নেবে এই নির্বাচনে ব্যয় করার জন্য। ইতিমধ্যেই বিজেপি শিবির ও কংগ্রেস শিবির শরিকদের সাথে ভাগ বাঁটোয়ারা করে কে ক'টা আসন কোন রাজ্যে নেবে সেই আলোচনাও শুরু হয়ে গেছে। এমনকী এখনই ঘোষণা হয়ে গেছে কোন রাজ্যে কে ক'টা সিট জিতছে— অথচ ভোট এখনও হয়নি, ভোটের গণনার

প্রশ্ন তো ওঠেই না! ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁরা ৪২টা আসনেই জিতছেন। বিজেপিকে হারাতে পারলে দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে কে বসবে তা নিয়েও নানা দাবিদার খাড়া করা হচ্ছে। সিপিএম-সিপিআই পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় রাজত্ব হারিয়েছে। কেরালায় কোনও রকমে টিকে আছে। তারা কংগ্রেস শিবিরের পিছনে ঘুর ঘুর করছে কোনও রকমে যদি ক'টা সিট জিততে পারে, যদি কংগ্রেস শিবির আগামী নির্বাচনে সরকার গঠন করে তা হলে সাথী হিসাবে অন্তত ক্ষমতার আশেপাশে তারা যাতে একটু স্থান লাভ করতে পারে। এই পরিবেশে একমাত্র আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণের দাবিতে সংগ্রাম চালাচ্ছে। এই সংগ্রাম করতে করতে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা নির্বাচনে নামব।

এই নির্বাচনী রাজনীতি প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষক মহান লেনিন ১৯১৮ সালে কী বলেছিলেন আপনাদের স্মরণ করাতে চাই। তখনও বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজকের মতো এত কদর্য রূপ নেয়নি, এতটা পচন ধরেনি। লেনিন বলেছেন "বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবরণ এবং এটা একবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তখন নির্বাচনের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির বা কোনও প্রতিষ্ঠানের বা কোনও পার্টির পরিবর্তনের দ্বারা এই বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে নড়ানো সম্ভব নয়। ... কয়েক বছর অন্তর শোষক শ্রেণির হয়ে কারা সরকারে বসবে এবং জনগণকে শোষণ-অত্যাচার করবে ইলেকশনের দ্বারা এটাই নির্ধারিত হয়"। মহান লেনিনের ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৭ সালে বলেছেন, "একটা সরকারের বিরুদ্ধে যখন জনগণ বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে তখন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরেকটা সরকার আসে। সাধারণ মানুষ কতকগুলি লোককে অসৎ মনে করে ভাবে সেই লোকগুলিকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য কতকগুলি সৎ লোক এসে বসলেই তাদের মঙ্গল হবে। এ ধরনের প্রচার বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা করে থাকে। কাজেই আমি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বলছি, তাঁরা যেন এই ধরনের ভাঁওতায় না ভোলেন। কারণ শুধুমাত্র সরকারের পরিবর্তন হলেই সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না। হতে পারে না। ভোটের মারফত হাজার বার সরকার পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইনকানুন সংশোধন করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনার

মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।" তিনি আরও বলেছেন, "ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং শ্রেণি সংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে, শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেইদিকে ভেসে যায়।" এই দুইজন মহান নেতার শিক্ষা আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম। যাতে মার্কসবাদী বিচারে নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী এটা বোঝা যায়।

আমাদের দেশে ১৯৫২ সাল থেকে বহুবার পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে এবং বেশ কয়েকবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এরাজ্যেও কংগ্রেস শাসন দীর্ঘদিন ছিল। পরে যুক্তফ্রন্ট সরকার, তারপর কংগ্রেস, তারপর সিপিএম, এখন তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। বারবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এরা সবাই ভোটের আগে পরিবর্তনের স্লোগান তুলেছে। কিন্তু সরকারের পরিবর্তন হচ্ছে, মন্ত্রীত্বের পরিবর্তন হচ্ছে, একদলের জায়গায় আরেক দল ক্ষমতায় আসছে, তাতে জনজীবনের অবস্থার কি কোনও পরিবর্তন হচ্ছে? আজ থেকে ৮ বছর আগে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, ১২১ কোটি মানুষের দেশে ৬২ কোটি হচ্ছে বেকার। সংখ্যাটা এখন নিশ্চয় ৭০ কোটিতে পৌঁছেছে। এই বেকার সংকটের কী সমাধান ঘটেছে আমাদের দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে? ছাঁটাই বন্ধ হয়েছে? জিনিসপত্রের দাম কমেছে? জনজীবনের কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে? বরং আরও বেড়েই চলেছে। তাই মার্কসবাদের শিক্ষা হচ্ছে, নির্বাচনের দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হয় না। পরিবর্তনের নামে শোষক শ্রেণির পলিটিকাল ম্যানেজারের পরিবর্তন হয় মাত্র।

মুসলিম বিরোধী সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে ভোটে বাজিমাত করার ষড়যন্ত্র এনআরসি

সম্প্রতি বিজেপি আসামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে এনআরসির আগুন জালিয়েছে, ৪০ লক্ষেরও বেশি ভারতবাসীকে বিদেশি তকমা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করছে তা এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই। সেই বিজেপির এক নেতা বলছেন, পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এলে তাঁরা এখানেও একই কাজ করবেন। অর্থাৎ এখান থেকেও তারা বিতাড়ন করবে। আসামে

অনুপ্রবেশকারী বলছে ৰাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমানদের, নেপালীদের, আদিবাসীদের — আর পশ্চিমবাংলায় বলছে মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী। বলছে, পশ্চিমবাংলায় বেকার সমস্যা হয়েছে এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। আমি প্রশ্ন করতে চাই, সংবাদপত্রে বেরিয়েছে গত বছরে উত্তরপ্রদেশে ৩৬৮টি পিওনের পোস্ট, ক্লাস ফোরের বিদ্যা হলে যে পিওনের পোস্ট পাওয়া যায়, তার জন্য দরখাস্ত করেছে ২৩ লক্ষ যুবক। এর মধ্যে গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, ডক্টরেট, ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত আছে। উত্তরপ্রদেশে কয়জন অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছিল? মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে, পাঞ্জাবে, গুজরাটে এত বেকার কেন? সারা দেশেই তো কোটি কোটি বেকার। কোথায় কত অনুপ্রবেশকারী ঢোকার ফলে বেকার সমস্যা বেড়েছে? এই মিথ্যা কথা বলে পশ্চিমবাংলায় হিন্দু সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে পূর্ববাংলা থেকে সেই '৪৭ সালে ও '৫০ সালে দাঙ্গার ফলে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এখানে আসেন, তাঁদের মধ্যে খানিকটা মুসলিমবিরোধী সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে আগামী ভোটে বাজিমাত করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আসামের ষড়যন্ত্রও ঠিক তাই। আসামে একটা অসমীয়া উগ্রপন্থী গোষ্ঠী আগে থেকেই এই দাবি তুলেছিল। গোটা আসামের অসমীয়া জনগণকে এর জন্য দায়ী করলে ভুল হবে। আসামের জনগণের মধ্যে চিন্তাশীল, সৎ, বিবেকবান মানুষ এই জিনিস সমর্থন করেন না। আমাদের দলের আসাম রাজ্য সম্পাদক নিজে অসমীয়াভাষী মানুষ। আমাদের দলে অনেক অসমীয়া কর্মী আছেন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে কাজ করছেন, লড়াই করছেন সেই ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে যখন 'আসু' আন্দোলন শুরু করেছিল। তখন থেকে একমাত্র আমাদের দলই এই প্রশ্নে ভিন্ন বক্তব্য রেখে আসছে। এই আমার বাঁদিকে পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বসে আছেন, তিনি তখন আসামের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। সর্বদলীয় বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিতাড়নের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে ৰা। আসামের উন্নয়নের জন্য, শিল্পায়নের জন্য, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিলও করেছিলেন তিনি। আমাদের দলই একমাত্র দল যে প্রথম থেকেই এনআরসি-র বিরোধিতা করে এসেছে। কংগ্রেসই তো প্রথম এনআরসি করার চুক্তি করেছিল, আজ বিজেপি সেটাই নিজেদের স্বার্থে কার্যকরী করছে। আজ যারা ভোটের জন্য এনআরসি-র বিরোধিতা করছে তারাও সেদিন সমর্থন করেছে। এবারও আসাম সরকার আলোচনার জন্য অন্য সব দলকে ডেকেছিল, কিন্তু আমাদের দলকে ডাকেনি। কংগ্রেস-সিপিআই-সিপিএম সহ সব দল

গিয়েছিল। সকলেই এনআরসি-কে সমর্থন করে এসেছে। এ রাজ্যেও ২০০৫ সালে তৃণমূল অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলেছিল। তখন সিপিএম সরকারকে সংখ্যালঘুদের বৃহৎ অংশ সমর্থন করত। অতএব সংখ্যালঘু ভোট পাবে না— এই হিসাব করে তখন তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিল পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। পার্লামেন্টে হইচই করেছিল। আজ তারা ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা, ঈদের নমাজের দিন মাথায় হিজাব পরে মুসলিম দরদি সেজে সংখ্যালঘু জনগণের একটা অংশকে বিভ্রান্ত করছে ভোটের স্বার্থে। এখন তার অন্য সেন্টিমেন্ট, বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সেন্টিমেন্ট তোলা দরকার। ওখানে বিজেপি অসমীয়া ভোট পাওয়ার জন্য এই কাণ্ড করছে। আবার বলছে খসড়া তালিকা সংশোধন করা হবে। অর্থাৎ এই কথা বলে বাঙালি মুসলিম ও হিন্দুদের গলায় ছুরি ধরে বলবে, 'বিজেপিকে ভোট দাও, টাকা দাও, নাম তুলে দেব'। সবটাই নির্বাচনের সাথে যুক্ত।

এ একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। হিটলার জার্মানি থেকে ইহুদি বিতাড়ন করেছিল। লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল। জাতিবিদ্বেষ জাগিয়েছিল। বিজেপি এখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাচ্ছে। এটা এখানেই থামবে না। বিহার ওড়িশায় আওয়াজ তোলাবে সেখান থেকে বাঙালি হটাও। মহারাষ্ট্রেও জিগির তোলাবে মারাঠী ছাড়া কেউ থাকবে না। সব রাজ্যেই জিগির তোলাবে অন্য রাজ্যের লোক হটাও। এমনিতেই রিজার্ভেশনের কোটা নিয়ে বাধানো বিরোধ চলছে। একটা ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পরিবেশ হবে, শুধু হিন্দু-মুসলিম নয়, এটাকে ভিত্তি করে উপজাতিগত দাঙ্গা, ভাষাগত দাঙ্গার আগুন গোটা দেশে তারা সৃষ্টি করতে চাইছে। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে— হিন্দু আসছে, গরিব মুসলমানও আসে। হিন্দু হলে 'শরণার্থী', মুসলিম হলে 'অনুপ্রবেশকারী'— এইসব তকমা লাগাচ্ছে। এটাও বিজেপির দুরভিসন্ধিমূলক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। গরিব মানুষ নানা দেশে যায়। আমাদের ভারতের গরিবরাও আরবে যাচ্ছে। আমি বলি, বহু ভারতীয় এখন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি ইত্যাদি বহু দেশে নাগরিক হয়ে আছে। নেপালেও বহু ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, নানা কাজ করছে। ওই সব দেশে যদি আওয়াজ ওঠে, ভারতীয়দের তাড়াও, ভারত সরকার মেনে নেবে? বিজেপি মেনে নেবে? আরবে যে সব ভারতীয় শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছিল, সৌদি আরব বলছে, আমাদের দেশের শ্রমিকরা বেকার, অতএব ভারতীয়দের চলে যেতে হবে। এতে ভারত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ভারতের টেকনিশিয়ানরা আমেরিকায় কাজ করতে যায়।

আমেরিকা বলছে, এইচ-ওয়ান বি ভিসা দেব না, ঢুকতে দেব না। ভারত প্রতিবাদ করছে। গরির মানুষ এ দেশ থেকে ও দেশে যাবেই। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা দেখতে হবে।

বাংলাদেশে দাঙ্গা হচ্ছে? বাংলাদেশে ক'টা দাঙ্গা হচ্ছে বলুন। ক'জন হিন্দু হত্যা হচ্ছে বাংলাদেশে? দাঙ্গা তো হচ্ছে এ দেশে। প্রতিদিন দাঙ্গা হচ্ছে। গোহত্যার নাম করে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। তাই বলছি, এটা একটা ভয়ঙ্কর ষড়্যন্ত্র। এর একটা উদ্দেশ্য— শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবিতে, শিক্ষার দাবিতে, স্বাস্থ্যের দাবিতে, চাকরির দাবিতে, ছাঁটাই প্রতিরোধে, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে আন্দোলন না করতে পারে। জনগণের ঐক্য ভেঙে দাও। ভ্রাতৃঘাতী বিদ্বেষের আগুন জ্বালাও। আরেকটা হচ্ছে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। এই হচ্ছে এইসব দলের রাজনীতি। আমরা এর বিরুদ্ধে। আমরা চাই এই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষের জনগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলা সকলের গণতান্ত্রিক ঐক্য।

প্রত্যেকবার ভোটের আগে এই দলগুলি পরিবর্তনের ধুয়া তোলে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হচ্ছে? যথার্থ পরিবর্তন কাকে বলে? প্রতিদিন জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণায় আপনারা ভুগছেন— চাকরি নেই, যাদের চাকরি আছে ছাঁটাইয়ের খড়গ ঝুলছে, যাদের চাকরি জুটছে তারাও অস্থায়ী, যা মজুরি দেয় তাই মানতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে ছেলেমেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের শহরে শহরে ঘুরছে। গ্রামীণ পারিবারিক জীবন ভেঙে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মাইগ্র্যান্ট লেবার কখনও এখানে কখনও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা হোক দু-চার টাকা যদি জোটে। গোটা দেশের এরকম একটা অবস্থা। পৃথিবীর ১১৯টি ক্ষুধার্ত দেশের তালিকায় ভারতবর্ষ তলার দিক থেকে ১০০ নম্বরে আছে। এখানে প্রতিদিন অনাহারে ২৩ কোটি লোক থাকে, যা বিশ্বে সব থেকে বেশি। এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফ্যামের সমীক্ষা। আমাদের দেশে শতকরা ৭৭ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। এখানে প্রতিদিন অনাহারে মারা যায় ৭ হাজার লোক। প্রতি ঘন্টায় আত্মহত্যা করে ৫ জন কৃষক। প্রতিদিন ১২০ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বলছে '১৪ থেকে '১৬— এই দুই বছরে ৩৫ হাজার ৩০২ জন আত্মহত্যা করেছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। কালো টাকা পাহাড় পরিমাণে বাড়ছে। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। বিজেপি সরকারের রাফাল বিমান কেনার দুর্নীতি কংগ্রেসের রাজীব গান্ধীর

বফর্স কেনার দুর্নীতিকেও ছাপিয়ে গেছে। কংগ্রেস এটাকেই ভোটে হাতিয়ার করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'! এখন তো দেখা যাচ্ছে, তিনি খেয়ে বসে আছেন। কংগ্রেস দেখাচ্ছে কে বেশি খেয়েছে, বফর্স না বাফাল! এই হচ্ছে দেশের উন্নয়ন! উন্নয়ন কি হয়নি? উন্নয়ন হয়েছে। ভারতবর্ষে গত এক বছরে ১ শতাংশ ধনকুবেরের সম্পদ বেড়েছে ২০.৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা দেশের ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের মোট বাজেটের সমান। ডিজেল-পেট্রলের দাম বাড়িয়ে এক বছরে পাবলিকের রক্ত চুষে ১০ লক্ষ কোটি টাকা সরকার আয় করেছে। ঋণের দায়ে প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক আত্মহত্যা করছে। অন্যদিকে পুঁজিপতিদের কয়েক লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছে এই সরকার, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করতে দিয়েছে।

নির্বাচন মানে টাকার খেলা

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুকেশ আম্বানির ইউনিভার্সিটির নাম ঘোষণা হয়েছে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি হিসাবে। অথচ এখনও জায়গা ঠিক হয়নি, বিল্ডিংও হয়নি, ক্লাস হওয়া তো দূরেব কথা। তাকেই কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে 'উৎকর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়'। বিশ্বে এইরকম আজব ঘটনা কেউ দেখেনি। এই নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। এই মুকেশ আম্বানির গত বছরে লাভ বেড়েছে ৬৬ শতাংশ। গৌতম আদানিরও আয় বেড়েছে ৬৬ শতাংশ। আর একজন গেরুয়া পরা 'সর্বস্বত্যাগী' সন্ন্যাসী শিল্পপতি হলেন বাবা রামদেব, তাঁর আয় বেড়েছে ১৭৩ শতাংশ। বিজেপির সভাপতি অমিত শাহর আয় বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। অমিত শাহর ছেলের আয় বেড়েছে ১৬ হাজার শতাংশ। তা হলে কার উন্নয়ন হয়েছে? হয়েছে এ দেশের শিল্পপতিদের, পুঁজিপতিদের, যারা শাসক দলকে নির্বাচনে টাকা জোগায়। গতবার বিজেপিকে দিয়েছে। আবার একদল শিল্পপতি যারা বিজেপির শাসনে সুবিধা পায়নি, তারা কংগ্রেসকে টাকা জোগাবে। নির্বাচন মানেই তো এখন টাকার খেলা! কোথায় 'বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল'? এটা আজ শুধু পাঠ্যপুস্তকেই আছে। সকলেই জানে ভোটের ফল কে ঠিক করে। মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার। শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের টাকা আর ক্রিমিনাল বাহিনী, খবরের কাগজ টিভির প্রচার এবং আমলারা— এরা মিলে ঠিক করে কে জিতবে, কে হারবে। প্রধান শক্তি হচ্ছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা। তারা এই

ক্রিমিনাল বাহিনীকে কন্ট্রোল করে, টাকা জোগায়, তারাই খবরের কাগজ, টিভিকে চালায়, প্রশাসন যন্ত্র তাদের অঙ্গুলিহেলনে চলে। এই তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রে 'ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন'! আগামী নির্বাচনেও দেখবেন, কোটি কোটি টাকার খেলা চলবে। আগেকার দিনে কংগ্রেস ভোট করতে গ্রামের জমিদার-জোতদারদের হাতে টাকা দিত, তারা মানুষকে ভোটের আগে কিছু চাল-ডাল দিত। এখন একেবারে ঘরে ঘরে টাকা পৌঁছে দেয়। সাধারণ গরির ভোটারদের মানসিকতাও এমন করে দেওয়া হয়েছে যে তারা ভাবে, আর তো কিছু পাব না, এই ভোটের সময়ই যা কিছু টাকা পাই তাই যথেষ্ট। হাজার হাজার বেকার যুবক, ভোটের সময় তারা প্রচার করার, ডান্ডাবাজি করার, থ্রেট করার, ব্যালট বাক্স ভাঙার চাকরি পায়। তারাও হাজার হাজার টাকা রোজগার করে। এই দল, ওই দলের ঝান্ডা নিয়ে কাজ করে। সারা বছর লুটেপুটে খায় আর ভোটে এই কাজ করে। যেহেতু সরকারি দলের ব্যাকিং আছে, পুলিশ টুঁ শব্দও করে না। 'ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স' নয়, বাস্তবে এই পলিটিশিয়ানরাই যুবকদের ক্রিমিনালাইজ করছে। এইসব করে ভোট চলে। এই তো বৃহত্তম দেশের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন! গত নির্বাচনে আপনারা দেখেছেন, বিজেপি নিয়ে কাগজে-টিভিতে কী হইচই হয়েছে— ভারতবর্ষের 'আচ্ছে দিন' আসছে! এখন তো সকলেই দেখছেন কী রকম আচ্ছে দিন এসেছে। বিজেপি বলেছিল, এক মাসের মধ্যে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে পৌঁছে দেবে। আধ পয়সাও কেউ পায়নি, চার বছর হয়ে গেল। পুরোপুরি একটা ধাপ্পাবাজি। বলেছিল, এক মাসের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেব, সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করব। ভারতীয় শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের ৭০ লক্ষ কোটি টাকা একমাত্র সুইস ব্যাঙ্কেই আছে। প্রতি মাসে সাত হাজার কোটি করে ওখানে কালো টাকা জমছে। নীরব মোদি, ললিত মোদি, মেহুল চোক্সি, বিজয় মালিয়া— এইসব ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা লুঠ করে আজ বিদেশে পালিয়ে গেছে। এদের সাথে নরেন্দ্র মোদির দহরম মহরম আছে। নীরব মোদির সাথে তাঁর ছবি কাগজে বেরিয়েছে। মেহুল চোক্সিকে নরেন্দ্র মোদি সাদরে বলেছেন 'মেহুল ভাই', কাগজে বেরিয়েছে। তার সাফাই গাইতে গিয়ে মোদি বলেছেন, 'তাতে কী হয়েছে? আমি সৎ এবং ভাল মন নিয়ে এদের সঙ্গে মিশি। আমার মনে কোনও দাগ পড়ে না।' তারপর অজুহাত দিয়েছেন, গান্ধীজিও তো বিড়লার সাথে মিশতেন। গান্ধীও গুজরাট থেকে এসেছেন। তিনিও গুজরাট থেকে এসেছেন। ফলে তিনি নব্য গান্ধী সেজেছেন। এত কিছুর পরেও তাঁর মনে কোনও দাগ কাটে না, কারণ তিনি

হচ্ছেন কাশীর এমপি। কাশীধামের বিশুদ্ধ গঙ্গাজল দিয়ে তাঁর মন ধোয়া তুলসী পাতা! ফলে তাঁর গায়ে দুর্নীতির কোনও দাগ নেই! তিনি সব রকম পাঁকে ডুবতে পারেন, কিন্তু মন একেবারে পরিষ্কার, সাদা থাকে, এমন সৎ, চরিত্রবান! এইসব বুজরুকি দেশের মানুষকে বোঝাচ্ছেন। কারণ মনে করেন, সবাই বোকা, টাকা আর প্রচারের জোরে দিনকে রাত করা যায়।

ভোট যেন দুর্নীতির উৎসব

এখন ভোটকে একটা দুর্নীতির উৎসব বলা যায়। ১৯৬৭, '৬৯ সালে যা হত, এখন তার থেকে শত সহস্র গুণ বেশি দুর্নীতি ভোটে হয়। পাড়ায় পাড়ায় যান— এক দল বেকার যুবক দিন গুনছে আবার কবে ভোট আসছে। এবার কত টাকা তারা কামাবে এই হিসাব কষছে। এই যুবকদের চরিত্র মনুষ্যত্ব নৈতিকতাকে ওরা ধ্বংস করেছে, এ-ও আরেকটা আক্রমণ। ওদের আত্মসম্ভ্রমবোধ নষ্ট করেছে, টাকার কেনা গোলাম বানিয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক জিনিস আমরা লক্ষ করছি। টাকা দিচ্ছে, ভোট দেব। কিছু টাকা তো দিচ্ছে। যে বেশি টাকা দেবে, তাকে বেশি ভোট দেব। এই যে এরা টাকা দিচ্ছে, তা কার টাকা? তাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া টাকা? এই টাকা কোথা থেকে তারা দিচ্ছে? মানুষ একবারও ভাবে না এই টাকা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের টাকা, পুঁজিপতিদের টাকা। যে পুঁজিপতিরা দু'বেলা শোষণ করে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, শ্রমিক ছাঁটাই করে, শ্রমিকের রক্ত নিংড়ে, কৃষকের রক্ত নিংড়ে শোষণ করে কোটি কোটি টাকা আয় করছে। তারাই আবার এই দলগুলিকে টাকা দেয় নির্বাচনে জেতার জন্য। এটা তাদের ইনভেস্টমেন্ট। ব্যবসায় ইনভেস্টমেন্টের মতো ভোটে ইনভেস্টমেন্ট। এর পরিবর্তে তারা রিটার্ন পাবে। আরও টাকা লুটবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, নানা দুর্নীতির পথে শ্রমিক-কৃষক-জনগণকে ঠকিয়ে আরও টাকা কামাবে। যারা সরকারি গদিতে বসবে, তারা এদের গোলাম হয়ে কাজ করবে। অবশ্য তারাও সরকারি টাকা, যেটা পাবলিকেরই টাকা, সেখান থেকে লুটবে। কমরেড ঘোষ বলেছেন, রাজনৈতিক চেতনা না থাকার ফলেই জনগণ এই ফাঁদে পড়ে যায়। অভাবী ক্ষুধার্ত মানুষকে তারা এভাবে ভোটের সময় ভিক্ষা দিয়ে পরে সুদে-আসলে আদায় করে। মানুষ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে। তৃণমূল শাসনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের দিকে যান, গৃহনির্মাণে কী ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। ধরুন একটা ঘরের জন্য বরাদ্দ এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। এক লক্ষ টাকা বাড়ির মালিককে দিয়ে ষাট হাজার

টাকা পকেটে পুরে নেয়। যার প্রাপ্য টাকা সরকারি দলের এজেন্টরা মেরে দিচ্ছে, সেও মনে করছে ওদের তো কিছু দিতে হবে। স্কুলের মাস্টারি বা যে কোনও চাকরি পেতে হলে ৭-৮ লক্ষ টাকা এমনকী ১০-১৫ লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, অনেকে আগাম আদায়ও করে। গরিব মানুষ জমি-জমা বিক্রি করে ধার-দেনা করে টাকা দিচ্ছে একটা চাকরির জন্য। ১০০ দিনের কাজেও নানা কারচুপি চলছে। ৫০-৬০ দিন কাজ করিয়ে ১০০ দিনের কাজ দেখিয়ে মজুরির টাকায় ম্যানেজাররা ভাগ বসায়। অভাব গ্রামের গরিবদেরও দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। কলেজে ভর্তিতে পর্যন্ত তোলাবাজি চলছে। সিন্ডিকেটের রাজত্ব চলছে। প্রত্যেক দোকানদারকে, ব্যবসারদারকে তোলা দিতে হয়। ফুটপাতের হকারদেরও তোলা দিতে হয়। সরকারি দলকে তোলা দিতে হবে। সিপিএম আমলে এসব শুরু হয়েছে, 'পরিবর্তন' ও 'দুর্নীতি দমনের' আওয়াজ তুলে তৃণমূলও তা চালিয়ে যাচ্ছে। এটাই অলিখিত নিয়ম। পার্থক্য হচ্ছে সিপিএম আমলে গুছিয়ে কিছুটা আড়ালে আবডালে চলত, এখন সবই খোলামেলা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কন্যাশ্রী বিতরণ করছেন, ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ করছেন। খুব প্রচার চলছে, কত নারী দরদী! অথচ পশ্চিমবঙ্গ নারী পাচারে ভারতবর্ষে প্রথম স্থানে, নারী ধর্ষণে দ্বিতীয় স্থানে আছে। এ সব প্রতিরোধে সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। যেন এ সব কিছুই হচ্ছে না। কারা পাচার করছে তা কি সরকার জানে না? সব হাঁড়ির খবর রাখে, কোন বাড়ির কে কাকে ভোট দেবে, কাকে টাকা দিতে হবে, কাকে থ্রেট করতে হবে— এ সব জানে, আর কারা লাখ লাখ মেয়ে পাচার করছে তার খোঁজ রাখে না? কারণ যারা পাচার করে তারা সিপিএম আমলে যেমন তাদের তহবিলে টাকা দিত, এখন তৃণমূলের আমলে তৃণমূলের তহবিলে টাকা দেয়। শিশুপাচার হচ্ছে, পাচারকারীরা টাকা দিচ্ছে। মদের নেশায় যুবকদের বুঁদ করে আজ্ঞাবহ করার জন্য আর রাজকোষ বৃদ্ধির জন্য সিপিএম এক হাজার মদের দোকান খুলেছিল, আর তৃণমূল আরও এক হাজার বাড়াচ্ছে। এটাও ওদের একটা জনকল্যাণ কর্মসূচি! সিপিএমের পথেই পুলিশ-প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষায়তন পরিচালনা সর্বত্রই দলতন্ত্র কায়েম করেছে। যুবশ্রী, ক্লাবশ্রী ইত্যাদি নানা শ্রী বিতরণ করছে ভোটে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। 'সংখ্যালঘু দরদি' সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য কী করেছে? একমাত্র কিছু ভড়ং ছাড়া? সিপিএমও তাই করেছিল। আজও সংখ্যালঘুরা তুলনায় সবচেয়ে গরির ও অশিক্ষিত। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে এ রাজ্যে ৩০ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সেখানে সরকারি চাকরিতে

মাত্র ৬ শতাংশ সংখ্যালঘু। তার বিশেষ বৃদ্ধি এখনও হয়নি। বিজেপি চায় তৃণমূল সংখ্যালঘুদের প্রতি দরদ দেখাক, তা দেখিয়ে বিজেপির দিকে হিন্দু ভোট টানা যাবে। আর তৃণমূল চায় বিজেপি সংখ্যালঘু বিরোধী আওয়াজ তুলুক তাহলে তাদের ভোট তৃণমূল পুরোপুরি পাবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নামে এইসব ভণ্ডামি চলছে। ভোটে বারবার মার খেয়ে জনগণ প্রচারের হাওয়া দেখে ভাবে, এ বার একে পাল্টাই, ওকে আনি। এই যে কেন্দ্রে একবার কংগ্রেসকে ঠেকাতে হলে বিজেপিকে চাই, আবার এখন বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেসকে চাই, এ রাজ্যে কংগ্রেসকে ঠেকাতে হলে সিপিএমকে চাই, সিপিএমকে ঠেকাতে তৃণমূলকে চাই, আবার এখন একদল বলছে তৃণমূলকে ঠেকাতে হলে বিজেপিকে চাই। এই সব চিন্তা সর্বনাশা। এভাবে জনগণ বারবার ঠেকাচ্ছে, কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখছে এভাবে বারবার ঠেকাতে গিয়ে নিজেরা কোথায় গিয়ে ঠেকছে! শেষ পর্যন্ত নিজেদের পিঠ ঠেকাবার জন্য দেওয়ালও থাকছে না। রাজনীতি না বুঝলে, দল না চিনলে সংবাদ মাধ্যমের প্রচারের হাওয়ায় ভেসে গেলে বারবার এভাবেই ঠকতে হবে।

কংগ্রেস কি সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক?

অবিভক্ত বাংলা একদিন ভারতবর্ষে বামপন্থার কেন্দ্রভূমি ছিল। কলকাতা শহর ব্রিটিশদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। নেহরু কলকাতাকে 'দুঃস্বপ্নের নগরী' বলতেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কলকাতায় ৩/৪টি বাদ দিয়ে সমস্ত সিটে বামপন্থী হিসাবে জিতেছিল সিপিআই। এই ছিল বাংলার ঐতিহ্য। একদিকে মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে তুং-কে ভিত্তি করে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা বিশ্বব্যাপী চলছিল, আরেক দিকে বাংলায় ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদী ধারা বা বামপন্থার ঐতিহ্য ছিল। এই দুইয়ের গৌরবকে প্রথমে সিপিআই পরবর্তীকালে সিপিএম আত্মসাৎ করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। সেই সিপিআই ও পরে সিপিএম ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত গণআন্দোলনে ছিল। যদিও তারা কোনও দিনই মার্কসবাদী ছিল না। কিন্তু ১৯৬৭ সালে সরকারে বসার পর থেকে তাদের ভোল পাল্টাতে থাকে। গণআন্দোলনের পথ ছেড়ে নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতির দিকে, বুর্জোয়া শ্রেণিকে সন্তুষ্ট করে গদি লাভের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সেই সিপিএমের ৩৪ বছরের রাজত্ব আপনারা দেখেছেন। কীভাবে ব্যারাকপুরে শ্রমিকদের হত্যা করেছে। খিদিরপুর বন্দরে শ্রমিকদের হত্যা করেছে, নদীয়ার

কৃষকদের হত্যা করেছে, নন্দীগ্রামে গণহত্যা, গণধর্ষণ করেছে, সিঙ্গুরে কীভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। সবই সরকাবি ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে পুঁজিপতিশ্রেণিকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সেই সিপিএম-সিপিআই আজ কংগ্রেসের গায়ে 'সেক্যুলার' আর 'ডেমোক্রেটিক' তকমা লাগিয়ে ঐক্য করার দিকে যাচ্ছে। কংগ্রেস কি সেক্যুলার? সেক্যুলার হিউম্যানিজম, সেক্যুলারিজম কথার বাংলা অর্থ হচ্ছে পার্থিব মানবতাবাদ। এই পার্থিব মানবতাবাদ ইতিহাসে এসেছিল ইউরোপের নবজাগরণের যুগে। তখন শাসন ব্যবস্থা ছিল ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্র। ধর্মেব বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল সেই যুগের নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণি এবং ভূমিদাসরা শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনে। সেইসময় এসেছিল ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদ। মানুষের পরিচয় ধর্ম দিয়ে নয়, জাত-বর্ণ দিয়ে নয়, নারী পুরুষ এই দিয়ে নয়। মানুষের পরিচয় মনুষ্যত্ব দিয়ে। এ দেশে কংগ্রেস কোনও দিন এব চর্চা করেনি। কংগ্রেস ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চর্চা করেছে। এটা সেক্যুলারিজম নয়। এই সম্পর্কে পরে আরও বলব। আর এখন তো রাহুল গান্ধী আর নরেন্দ্র মোদি ভোটের আগে দৌড় দিচ্ছে কে আগে কোন মন্দিরে ধরনা দেবে। কংগ্রেস এমনই সেক্যুলার! বিজেপি যেমন বারবার দাঙ্গার আগুন জ্বালাচ্ছে, কংগ্রেসও তো এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। রাউরকেল্লায়, ভাগলপুরে, নেলিতে, দিল্লিতে তারাই তো দাঙ্গা বাধিয়েছিল। যে কংগ্রেস ইমারজেন্সি জারি করেছে, টাডা, মিসা, ডিস্টার্ব এরিয়া অ্যাক্ট, আফস্পা চালু করেছে, তাকেই সিপিএম, সিপিআই গণতান্ত্রিক বানাচ্ছে।

গান্ধীজি ও বিড়লার সম্পর্ক

এখন গান্ধীজির সাথে বিড়লার সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। এ কথা ঠিক, বিড়লার সাথে, শিল্পপতিদের সাথে গান্ধীজির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গান্ধীজি এখনকার নেতাদের মতো অসৎ, সুবিধাবাদী ছিলেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, গান্ধীজি সৎ ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তা ছিল ভ্রান্ত। সমাজ যে ইতিহাসের গতিপথে বুর্জোয়া এবং শ্রমিক এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, সমাজে যে কোনও ব্যক্তির চিন্তা এমনকী তাঁর অজ্ঞাতসারে হলেও যে একটা বিশেষ শ্রেণির চিন্তা— গান্ধীজি এ সত্য অস্বীকার করেছিলেন। গান্ধীজি সত্যানুসন্ধানের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেননি। ধর্মীয় চিন্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। এটাই বিড়লারা চেয়েছিল। বিড়লাদেরও প্রয়োজন ছিল দেশে ধর্মীয় চিন্তা থাকুক। ধর্মান্ধতা থাকুক।

বিড়লারা চেয়েছিল, ইংরেজরা চলে যাক, তার পরিবর্তে বিড়লা, টাটা এইসব ভারতীয় শিল্পপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা দেশের শাসন ক্ষমতায় বসুক, যাতে তারা নিজেদের শোষণের সাম্রাজ্য পাকাপোক্ত করতে পারে। যেটা এখন তারা চালিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীজিকে সামনে রেখে তারা এই লক্ষ্য পূরণ করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর গান্ধীজি মনে করতেন আমি সৎ, আমি ধার্মিক। গান্ধীজি নিজে এমন পর্যন্ত বলেছিলেন, 'আমি যা বলছি সেটা ভগবানের বাণী। মাঝরাতে আমি ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। এরং সেটাই আমি লিখি। যদি গোটা বিশ্ব আমার বিরুদ্ধে বলে, তাহলেও আমি বলব আমি যা বলছি তা ভগবানের বাণী।' আর এই গান্ধীজিই বলেছেন, 'ভগবান মালিক-শ্রমিক সৃষ্টি করেছে। উভয়ের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমি মালিকদের হৃদয় পরিবর্তন করর যাতে মালিকরা তাদের এই হতভাগ্য শ্রমিকদের জন্য দয়া প্রদর্শন করে। মালিকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনটুকু নিয়ে বাকিটা ট্রাস্টি হিসাবে রাখবে জনগণের জন্য।' এই ভ্রান্ত চিন্তার দ্বারা গান্ধীজি পরিচালিত হয়েছিলেন। যেজন্য শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'গান্ধীজিকে ঘিরে রয়েছে বণিকরা। তাঁর আসল ভয় বিপ্লবকে, সমাজতন্ত্রকে।' শরৎচন্দ্র এ কথাও বলেছিলেন, 'যাঁদের হওয়ার কথা ছিল সন্ন্যাসী, তাঁরা হলেন দেশের নেতা। এইজন্যই ভারতবর্ষের পলিটিক্সের এত দুর্গতি। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'শিল্পপতি, জমিদার, জোতদার এরা নিজেদের দেশপ্রেমিক দাবি করছে। কারণ তারা দাবি করছে তারা গান্ধীবাদী।' শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিংও গান্ধীজিকে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই গান্ধীজি সেইযুগে ধর্মীয় চিন্তাকে সামনে রেখে স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজির হয়েছিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণি চেয়েছিল দেশে ধর্মান্ধতা থাকুক। যুক্তি, বিজ্ঞানধর্মী চিন্তা, তর্ক করা, প্রশ্ন করার মানসিকতা যেন না থাকে। কেন আমি গরিব, কেন আমি বেকার, কেন আমি ছাঁটাই হচ্ছি— এ সবের উত্তর হিসাবে অদৃষ্ট দায়ী, পূর্বজন্মের কর্মফল দায়ী, ভগবানের রিধান, বিধির বিধান— এই চিন্তা থাকলে পুঁজিবাদের আর কোনও ভয় নেই। এইজন্যই তাদের ধর্মীয় চিন্তা দরকার। অথচ অনেকেই জানে না নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন, 'সংস্কৃত শিক্ষা নয়, বেদান্ত শিক্ষা নয়, সংস্কৃত শিক্ষা ভারতবর্ষকে ২০০০ বছর অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছে। বেদান্ত বলে, বিশ্বে বাস্তব জগত বলে কিছু নেই। এর থেকে আধুনিক যুবকরা কিছু পাবে না। ফলে চাই ইউরোপ থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, চাই যুক্তি, চাই অঙ্কশাস্ত্র, চাই পাশ্চাত্য দর্শন।' এরই পথ বেয়ে আসেন বিদ্যাসাগর, গভীর

শ্রদ্ধায় যাঁর পায়ের তলায় সে যুগের সকলেই মাথা নিচু করেছিলেন, তিনি সমস্ত ধর্মীয় শাস্ত্র পড়ে 'পণ্ডিত' উপাধি পেয়েছিলেন। ২২ বছর বয়সে ইংরেজি শেখেন, তারপর পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বললেন, বেদান্ত সাংখ্য মিথ্যা, ভ্রান্ত। এর মধ্যে কোনও সত্য নেই। ফলে ইউরোপ থেকে এমন দর্শন পড়ানো হোক যাতে আমাদের দেশের ছেলেরা বুঝতে পারে বেদান্ত সাংখ্য মিথ্যা। তিনি বলেছেন, যেখানে যেখানে ইউরোপের জ্ঞানের আলো পৌঁছাচ্ছে সেখানে ভারতীয় ধর্মীয় শাস্ত্রের প্রভাব কমছে। ফলে এর প্রচার চাই, প্রসার চাই। বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না। কোনও দিন পূজা করেননি। বিদ্যাসাগরের বাড়ি এসেছিলেন রামকৃষ্ণ, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। রামকৃষ্ণ জানতেন বিদ্যাসাগর ভগবান,পূজা বিশ্বাস করেন না। অনুরোধ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি যেতে। বিদ্যাসাগর যাননি। এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের চরিত্র। নবজাগরণের চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও বলেছিলেন, যে দেশে ধর্মের মিলনে মানুষকে মেলানোর চেষ্টা হয় সে দেশের সর্বনাশ হয়। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'সমস্ত ধর্মই মিথ্যা। আদিম যুগের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নাই।' বলেছেন, 'বেদ মানুষের সৃষ্টি। তাতেও মিথ্যার অভাব নেই।' আরও বলেছেন, 'ভারতবর্ষে জন্মেছি বলেই ভারতীয় ঐতিহ্য বহন করতে হবে? গেলই বা বিশেষত্ব হারিয়ে। ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই তো ভয়? বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে তো চেনা যাবে। তার গৌরবই বা কম কী?' বলেছেন, আদর্শের কথা যখন বলবে তখন হিন্দুর আদর্শ, ভারতীয় আদর্শ, এশিয়ার আদর্শ এইসব নয়, বিশ্বমানবতার আদর্শের কথা বল। এই ছিল নবজাগরণের পার্থির মানবতাবাদের কণ্ঠস্বর। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। রাজনীতি পরিচালিত হবে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যুক্তি দ্বারা। নজরুলের বক্তব্যও তাই। আরও অনেকে সেইসময় এইসব বক্তব্য রেখেছিলেন। গান্ধীজিকে সামনে রেখে সেদিন জাতীয় বুর্জোয়ারা এই সেক্যুলার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রহণ করতে দেয়নি। তার ফলে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার দূর করা যায়নি। সমাজ বিপ্লব ঘটেনি। এরই পরিণতিতে দেশে আজও প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ, রর্ণভেদ, ভাষাগত আঞ্চলিকতার বিরোধ, ধর্মীয় ভেদাভেদের বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, নারীমুক্তিও ঘটেনি।

বিবেকানন্দ না আর এস এস—প্রকৃত হিন্দু কে?

এরই সুযোগ নিয়ে আরএসএস-বিজেপি মাথা তুলেছে। তারা ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধ্বনি তুলছে। রামমোহন বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক বক্তব্যের রিপরীতে সংস্কৃত শিক্ষা, বেদ-বেদান্ত শিক্ষার কর্মসূচি এনেছে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মননকে ধ্বংস করার জন্য, যেটা ফ্যাসিবাদের কর্মসূচি।

বিজেপি, আর এস এস কি যথার্থই হিন্দু ধর্মকে অনুসরণ করছে? বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শেষ সৎ প্রতিনিধি। বিবেকানন্দের চিন্তার সাথে আমাদের পার্থক্য আছে, কিন্তু বড় মানুষ হিসাবে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আমি সেটা এখানে আলোচনা করছি না। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি। আমি চাই হিন্দু ইসলাম খ্রিস্টান সব ধর্ম মিলে এক ধর্ম হোক। এই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমার একটা ছেলে থাকলে তাকে এক পংক্তির মন্ত্র শেখাতাম, বড় হয়ে সে ঠিক করত সে বুদ্ধ না যিশু না মহম্মদের শিষ্য হবে। তারপর বলছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক এরং নির্বিরোধে আমার ছেলে খ্রিস্টান, আমার স্ত্রী বৌদ্ধ এরং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি। এই বিবেকানন্দের সাথে নাগপুরের আরএসএসের কোনও মিল আছে? এই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমি কৃষ্ণকে যেমন সম্মান করি, হজরত মহম্মদকেও তেমন সম্মান করি। রামকৃষ্ণ মসজিদে নামাজ পড়েছিলেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা বলি জল, ওরা বলে পানি আর খ্রিস্টানরা বলে ওয়াটার। এই তো হিন্দু মুসলমান আর খ্রিস্টান ধর্মের পার্থক্য।

এর আগেও আমরা বলেছিলাম, চৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কি কাপুরুষ ছিলেন? ওঁরা তো জানতেন বাবরি মসজিদ আছে। তাঁরা কি বাবরি মসজিদ ভাঙার স্লোগান তুলেছিলেন? বিজেপি স্রেফ ভোটের জন্য একটা ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে ধ্বংস করল। যেমন করে তালিবানরা বামিয়ানে বুদ্ধের মূর্তি ধ্বংস করেছে। যদি চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হিন্দু হন তা হলে আরএসএস-বিজেপি নেতারা কেউ যথার্থ হিন্দু নয়। বাল্মিকী রামায়ণে কি আছে— রামের জন্মভূমি ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল? কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে? তুলসীদাসের রামায়ণে আছে? দেশের মানুষকে এ কথা ভাবতে হবে।

এ দেশের যুবকরা কাকে গ্রহণ করবে— সুভাষচন্দ্র সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের না স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী আরএসএস কে?

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "... হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দুরাজ'-এর ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। ... এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থলোভে (হিন্দু-মুসলিম) উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে— স্বাধীনতা সংগ্রামে এ শ্রেণির লোককেও শত্রু গণ্য করা প্রয়োজন" (রচনাবলি, ২য় খণ্ড)। তিনি ১৯৪০ সালে ঝাড়গ্রামে আরও বলেছেন, "...সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠাইয়াছে। ... ধর্মের সুযোগ নিয়া ধর্মকে কলুষিত করিয়া হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে" (১৪ মে, আনন্দবাজার পত্রিকা)। আর বিজেপির পথপ্রদর্শক গুরু গোলওয়ালকর ফ্যাসিস্ট হিটলারের ইহুদি বিতাড়ন ও নির্যাতনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, "হিন্দুস্থানের সমস্ত অ-হিন্দু মানুষ হয় হিন্দু ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে, হিন্দু জাতির গৌরব-গাথা ভিন্ন অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না। ... না হলে সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু জাতির এই দেশে তারা থাকবে অধীনস্থ হয়ে, কোনও দাবি-সুবিধা ছাড়া। এমনকি নাগরিক অধিকারও তাদের থাকবে না। (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড)। এ দেশের সাধারণ মানুষকে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও যুর সম্প্রদায়কে ঠিক করতে হবে কে সঠিক, সুভাষচন্দ্র না গোলওয়ালকর? তাঁরা কাকে মানবেন? বিজেপি এত মুসলিম বিদ্বেষের আগুন ছড়াচ্ছে, দাঙ্গা বাধাচ্ছে, সংখ্যালঘু ও দলিত হত্যা করাচ্ছে সেটা আরএসএসের এই শিক্ষা অনুযায়ী। হিন্দু রাজত্ব মানে সেখানে শুধু মুসলিমরাই নয়, দলিতরাও উচ্চবর্ণের অধীন হয়ে থাকবে। আপনারা কি জানেন, বিজেপির গার্জিয়ান আরএসএস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কোনও স্তরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেয়নি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়েছিল। এটা যে আমাদের বানানো অভিযোগ নয় তা তাদের গুরু গোলওয়ালকরের কথা শুনেই বুঝুন। তিনি বলেছেন, "ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং সর্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে আমাদের জাতিত্বের ধারণা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আমাদের প্রকৃত হিন্দুজাতিত্বের সদর্থক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। ... ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে সমার্থক

করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের ওপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে। ... তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা তাদের অন্তরে হিন্দু জাতির গৌরব পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দুজাতির স্বার্থহানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু" (ওই) । গোলওয়ালকরেব এই বিচারে দেশবন্ধু, লালা লাজপত, তিলক, বিপিন পাল এবং অন্য দিকে সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, আসফাকুল্লা খান, প্রীতিলতা ও অন্যেরা সকলেই 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'দেশের শত্রু' ছিলেন। কারণ তাঁরা কেউই হিন্দুবাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েননি, ঐক্যবদ্ধ ভারতকেই স্বাধীন করার জন্য লড়েছিলেন। আরএসএসের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য কি এ দেশের মানুষ, বাংলার জনগণ ও যুব সম্প্রদায় মেনে নিয়ে আর এস এস এবং বিজেপির ঝান্ডা বহন করবে?

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির ভূমিকা

অন্য দিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বুর্জোয়ারা সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে গান্ধীজিকে সামনে রেখে। সেদিন এ দেশের মানুষ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্রের বিপ্লববাদকে বুঝতে পারেনি, বিচার করতে পারেনি। ধরতে পারেনি কেন সশস্ত্র বিপ্লববাদী ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামদের গান্ধীবাদীরা বিরুদ্ধতা করেছিল, কেন গান্ধীবাদীরা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন করেছিল, এই সব বিষয় এ দেশের মানুষ জানত না। কারণ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ পরিচালিত খবরের কাগজ এইসব খবর দেয়নি। জনগণ বুঝতে পারেনি কেন গান্ধীজি বলেছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আমি স্বাধীনতা চাই না। কার স্বার্থে এই বক্তব্য? এই বক্তব্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে।

বিপ্লব হলে শ্রমিক-কৃষকের অভ্যুত্থান ঘটবে। পুঁজিপতিবা ক্ষমতায় আসতে পারবে না। ফলে বিপ্লব নয়, ইংরেজের সাথে আপস করে, দর কষাকষি করে ক্ষমতায় যেতে হবে। এই ছিল গান্ধীবাদী 'অহিংস' আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। বাস্তবে ঘটলও তাই। আরেকদিকে চিন্তার ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ এনেছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, ধর্মীয় চিন্তা, অধ্যাত্মবাদ গাইড করবে। যাতে পুঁজিবাদ বিরোধী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তা মানুষকে উদ্বুদ্ধ না করতে পারে। এই পথে ভারতীয় রেনেশাঁসের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত

সেকুলার মানবতাবাদের ঝাণ্ডাকেও ভূলুণ্ঠিত করা হল। এর সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা মুসলিম মাতব্বরদের বোঝালো, গান্ধীজি তো একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। এখানে মুসলিমদের ভবিষ্যৎ কী? এইভাবে পাকিস্তানের দারি তোলাল। হিন্দু মহাসভাও দেশ ভাগের দাবি জানাল। বিস্ময়কর হচ্ছে, ধর্ম ভিত্তিক জাতিতত্ত্বের যুক্তি খাড়া করে অবিভক্ত সিপিআই এই দেশভাগকে সমর্থন জানাল।

দেশভাগের পটভূমি

আপনাদের সামনে আমি দেশভাগের ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লালফৌজের কাছে হিটলার-মুসোলিনির ফাসিস্ট শক্তি পরাস্ত। পূর্ব ইউরোপ মুক্ত হয়েছে। লালফৌজ জাপানের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। চীনে মহান মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রাম বিজয়ের পথে। ইতিমধ্যে ভারতে '৪২-এর আগস্টে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াই-এর খবর এদেশে এসে গিয়েছে। গোটা দেশে সশস্ত্র লড়াইয়ের আবেগ প্রবলভাবে টগবগ করছে। গান্ধীবাদীরা তখন কোণঠাসা। ১৯৪৫ সালে বোম্বাইয়ে নৌসেনারা বিদ্রোহ করল। ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হওয়ার মতো অবস্থা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় পুঁজিবাদের প্রবল আতঙ্ক, দেশে সশস্ত্র বিপ্লব হয়ে যেতে পারে। সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্র করে ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধালো এবং নেহেরু, প্যাটেল গান্ধীজিকে চাপ দিয়ে দেশভাগ মানালো। গান্ধীজি দেশভাগ চাননি। যে গান্ধীজি আগাগোড়া সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন, শেষজীবনে দুঃখ করে তিনি বলেছেন, সুভাষচন্দ্র থাকলে দেশভাগ হত না। এ কথাও অনেকে জানেন না, এমনকী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে দু'জন মুসলমান সদস্য ছিলেন সেই সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফফর খান ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদই একমাত্র দেশভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে একটা দেশ প্রথমে দু'ভাগ, পরে তিনভাগ হয়ে গেল। অথচ এটা অনিবার্য ছিল না। জাতীয় কংগ্রেসের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ, আরএসএসের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, যথার্থ কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনুপস্থিতি, সিপিআইয়ের অমার্কসবাদী সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র এই সর্বনাশ ঘটাল। যার ফলে এই উপমহাদেশে আজও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। এই প্রসঙ্গে এটাও জানা দরকার যে গান্ধীবাদী

আন্দোলনের জন্য ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, এই ধরনের ধারণা প্রচার করা হয়। এটা সবৈব অসত্য। গান্ধীজির 'অহিংসা' ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য যদি সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় পরিবর্তন হত, তা হলে অনেক আগেই হত। বাস্তবে ১৯৪২ সালের আগস্ট অভ্যুত্থান, নেতাজির নেতৃত্বে আই এন এ-র লড়াই ও তার দেশব্যাপী প্রবল প্রভাব, ১৯৪৫ সালের বোম্বাইয়ের নৌসেনাদের বিদ্রোহ— এ সবই ভারতীয় পুঁজিবাদের মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরও আতঙ্কিত করেছিল। অন্য দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশরা যথেষ্ট হীনবল হয়েছিল এবং চীন ও পূর্ব এশিয়ায় মুক্তিসংগ্রাম তাদের সন্ত্রস্ত করেছিল। এর ফলেই তারা দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ মাইকেল এডওয়ার্ডস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ব্রিটিশরা গান্ধীজির নেতৃত্বকে বন্ধুরূপে মান্য করত এবং বিপ্লবীদের ভয়ের চোখে দেখত।

আগেই বলেছি, গান্ধীজির চিন্তা ভ্রান্ত ছিল, তিনি সৎ মানুষ ছিলেন। বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ অজ্ঞাতসারে তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল। তাতে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কথা আমি বলতে চাই, এটা ঘটতে পারল কেন? যেহেতু দেশে শোষিত সর্বহারা শ্রেণির কোনও যথার্থ দল ছিল না, সেই সুযোগে বুর্জোয়া শ্রেণি স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। কমিউনিস্ট নামধারীদের কী ভূমিকা ছিল? আগাগোড়া স্বাধীনতা আন্দোলনে সিপিআইয়ের (যার অংশ সিপিএম) ভূমিকা ছিল কলঙ্কজনক। তারা সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করে গান্ধীজিকে সমর্থন করেছিল। অথচ মহান স্ট্যালিন ১৯২৫ সালে ভারতের কমিউনিস্টদের গাইড লাইন দিয়েছিলেন যাতে তারা আপসকামী বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মধ্যবিত্ত বা পেটি বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়, সিপিআই '৪২-এর আগস্ট অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করে ব্রিটিশকে সমর্থন করেছিল, সুভাষচন্দ্রকে জাপানের দালাল ঘোষণা করেছিল। দেশভাগকে শুধু মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেসই নয়, সিপিআইও সমর্থন করেছিল। এগুলি কি নেহাতই ভুল ছিল? ভারতের জাতীয় পুঁজিবাদ যেখানে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে, মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে, বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করছে, সেখানে আজও সিপিআই ও সিপিএম সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আওড়ে কর্মীদের বিভ্রান্ত করছে। এটাও কি

নেহাতই ভুল? এগুলি সবই তো তাদের অমার্কসবাদী সোসাল ডেমোক্রেটিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই রাজনীতিই আজ তাদের নামাতে নামাতে এখানে এনে ফেলেছে, যাতে কখনও কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্র বিরোধিতার নামে (১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি, যার মধ্যে জনসংঘ, আরএসএস ছিল তাদের সাথে সিপিএম ঐক্য করেছিল। পরবর্তী কালে বিজেপি-সিপিএম যুক্তভাবে ভি পি সিং সরকারকে সমর্থ করেছিল) সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি-আরএসএসের সাথে ঐক্য করতে হচ্ছে, আবার কখনও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার নামে কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করতে হচ্ছে। এইভাবে যে কোনও বুর্জোয়া দলের হাত ধরে তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। কারণ, এখন যেভাবেই হোক ভোটে জেতা, সরকারি গদিতে বসা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপ্লবের কথা শিকেয় উঠে গেছে।

জনগণ বারবার ঠকছে কেন?

স্বাধীনতা আন্দোলনে আম্বানি-আদানি এদের তো কোনও নামই ছিল না। টাটা-বিড়লা পরিবারের কে প্রাণ দিয়েছিল? কে জেলে গিয়েছিল? প্রাণ দিয়েছিল সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। শত শত ছেলেমেয়ে জেলে গিয়েছে, গুলিতে প্রাণ দিয়েছে, কেরিয়ার ছেড়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের এই পরিণতি হল কেন? এই স্বাধীনতাই কি ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা-সূর্য সেন-আসফাকউল্লা খান-চন্দ্রশেখর আজাদরা চেয়েছিলেন? এই পরিণতি হল কেন? তার একটা কারণ, জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতারাও চেয়েছিলেন মানুষ অজ্ঞ থাকুক, অন্ধ থাকুক, আমরা যা বলি, নির্বিচারে মেনে নিক। আর সাধারণ মানুষের মধ্যেও এর প্রভাব ছিল। নেতারা যা হোক ঠিক করুক। আমরা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী করব?

এই যে অন্ধ থাকা, অজ্ঞ থাকা আর কাগজের দিকে, টিভির দিকে তাকিয়ে দল ঠিক করা, এতেই সর্বনাশ হচ্ছে। জনগণ বলে, নেতারা ঠকায়। ধরুন আমরাও ঠকাবো। কিন্তু আমরা চাইলেও ঠকাতে পারব কেন? জনগণ বারবার ঠকছে কেন? ঠকছে এইজন্য যে, তারা মাথা খাটাবে না, বিচার করবে না। যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ— এই প্রবচন মিথ্যা। রাম -সীতা-লক্ষ্মণ, হনুমান কেউই লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়নি। সীতার সর্বনাশ হল রাবণকে চিনতে পারেনি বলে। রাবণ এসেছিল সন্ন্যাসী সেজে। এখনকার নেতারাও দেশসেবক সেজে আসে। তা হলে, দল চিনতে হবে, রাজনীতি বুঝতে হবে। এখন দেখবেন, এইসব দলের নেতারা বিরাট বিরাট সমাবেশ করবে। ছবি বেরোবে, চোখের জল ফেলবে। দেশের জন্য তাদের ঘুম হচ্ছে না। এতদিন

ধরে তারা দেশসেবা করেছে। দেশসেবা করে করে আপনাদের একেবারে স্বর্গের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এবার পুরোপুরি স্বর্গে পৌঁছে দেবে। এইসব ভড়ং আপনাদের বুঝতে হবে। এইজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলেছেন, জনগণের রাজনৈতিক চেতনা চাই। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি চাই। 'জনগণ', 'দেশ' এইসব কথার কোনও মানে নেই। দেশ বিভক্ত— ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক, শোষক-শোষিতে বিভক্ত। রাজনীতি এবং দলও তাই। হয় মালিকের দল, না হলে শ্রমিকের দল। হয় শোষকের দল, না হয় শোষিত জনগণের দল। হয় ধনীর দল, না হয় গরিবের দল। হয় ভোট সর্বস্ব-গদি সর্বস্ব দল না হয় গণআন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রামী বিপ্লবী দল। দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ— এসব লোকভোলানো মিথ্যা কথা। তুমি পুঁজিবাদের পক্ষে না শ্রমিকের পক্ষে? তুমি শোষকের পক্ষে না শোষিতের পক্ষে? তোমার রাজনীতি ভোটসর্বস্ব না বিপ্লবী লক্ষ্যপূর্ণ? এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। এই হচ্ছে মার্কসবাদের শিক্ষা।

আজ ভারতবর্ষের, গোটা বিশ্বের অত্যন্ত দুর্দিন (প্রবল বৃষ্টির জন্য কমরেড প্রভাস ঘোষ এইসময় ভাষণ চালিয়ে যাবেন কি না জানতে চান, উপস্থিত শ্রোতারা সবাই হ্যাঁ বলেন)। সোভিয়েত, চিনের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর একটা প্রচার এ দেশের বুদ্ধিভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী বা মতলববাজরা করছেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদই একমাত্র পথ। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না, এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরকম একটা প্রচার করা হচ্ছে। আমি এখানে বলতে চাই, যে কোনও সমাজের জন্ম আছে, বিকাশ আছে, ক্ষয় আছে আবার তার পরিবর্তনও আছে। ইতিহাসের দিকে তাকান। সুদূর অতীতে আদিম সমাজ, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা, সম্পত্তি কিছু ছিল না। সেই সমাজটাই পাল্টে এল দাস-দাসপ্রভু ভিত্তিক দাসপ্রথা। প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। কয়েক হাজার বছর ছিল। এই সমাজ পাল্টে এল রাজা-প্রজা সম্পর্ক, সামন্তপ্রভু-ভূমিদাস সম্পর্ক। এটাও কয়েক হাজার বছর ছিল। এর পরে এল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র— ব্যক্তিগত মালিকানার যুগ। ইউরোপে প্রথম তার সূচনা। ভূমিদাসদের সংগঠিত করে সে যুগের সদ্য জন্ম নেওয়া যে বুর্জোয়া শ্রেণি লড়াই সংগঠিত করেছিল, তার কৈশোর-যৌবনে এই ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল প্রগতিশীল। কারণ এই ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করেই শিল্পবিপ্লব এসেছিল। ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করেই কুটির শিল্পের পরিবর্তে বড় বড় শিল্প উৎপাদন গড়ে ওঠা, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি— এসব এসেছিল সমাজ

বিকাশের প্রয়োজনে। আগে ভূমিদাসরা জমিদারের হুকুম ছাড়া বেরোতে পারত না, তাদের স্বাধীন শ্রমিকে পরিণত করা, ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা— এইসব অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি এসেছিল। এই শিল্পবিপ্লবকে ভিত্তি করেই ধর্মকে ফাইট করতে হয়েছিল। কারণ ধর্মকে ফাইট না করলে, তৎকালীন অন্ধবিশ্বাস— রাজা ভগবানের প্রতিনিধি, এই ধারণা থেকে মুক্ত করতে না পারলে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এই প্রয়োজনে এল বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তিবাদী মনন। এই সময় উঠেছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগান। কিছুটা অগ্রগতির পর আবার পরবর্তীকালে ইতিহাসের নিয়মে সেই ব্যক্তিগত মালিকানাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংকট ডেকে আনল। প্রশ্ন উঠল, সমাজে সম্পদ সৃষ্টি করছে কারা? বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডো দেখালেন, সম্পদের স্রষ্টা মানুষের শ্রম। মার্কস বললেন, শ্রম যদি সম্পদের স্রষ্টা হয় তবে শ্রমিক সেই সম্পদের মালিক হবে না কেন? শ্রমজীবী মানুষ কেন দারিদ্রে নিমজ্জিত থাকবে? পুঁজিপতির পুঁজি কোথা থেকে এল? পুঁজিরও স্রষ্টা হচ্ছে শ্রমিক, পুঁজিপতি নয়। টাকা এসেছে সম্পদ বা পণ্যের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে। এছাড়া টাকার অন্য কোনও মূল্য নেই। মার্কস অঙ্ক কষে দেখালেন, যাকে সারপ্লাস ভ্যালু বলা হয় তা আসছে আনপেড সারপ্লাস লেবার থেকে। এখান থেকেই পুঁজিপতিরা লাভ করে। পুঁজিপতিরা শ্রমিককে যে পরিমাণ সময়ের শ্রমের মূল্য হিসাবে মজুরি দেয় তার থেকে বেশি সময় খাটায়। যে সময়ের মজুরি দিচ্ছে তার থেকে অতিরিক্ত সময় খাটিয়ে সেই অংশটায় যে অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে, তার থেকে লাভ হিসাবে আত্মসাৎ করে মালিক। মার্কসের এই তত্ত্বকে আজও কোনও বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি।

পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানাই সর্বাত্মক সংকটের জন্ম দিয়েছে

পুঁজিবাদ অগ্রগতির পথেই ক্ষুদ্রপুঁজি থেকে বৃহৎপুঁজির, বৃহৎপুঁজি থেকে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিল। ছোট, মাঝারি পুঁজিকে গ্রাস করেই হয় একচেটিয়া পুঁজি। লেনিন বললেন, একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগ হল পুঁজিবাদের ক্ষয়ের যুগ, জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদের যুগ। আজকের বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পুঁজিবাদের একচেটিয়া মালিকানায় গোটা বিশ্বের অবস্থা কী? অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট বলছে, ১ শতাংশ ধনী বিশ্বের ৮২ শতাংশ সম্পদের মালিক। গোটা বিশ্বে এখন লোকসংখ্যা যদি হয় সাড়ে ছ'শো কোটি তবে তিনশো কোটি লোকের দৈনিক রোজগার ১৬৫ টাকা, আর একশো

কোটি লোকের দৈনিক আয় ৮২ টাকা। সাড়ে ছশো কোটি লোকের মধ্যে চারশো কোটি লোকের এই অবস্থা! এই নিয়ে পুঁজিবাদী বাজার। এদের ক্রয়ক্ষমতা কোথায়! ফলে বাজার সংকুচিত হবেই, আর সংকুচিত বাজারের দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী-পুজিপতিদের মধ্যে কাড়াকাড়ি-মারামারি চলবেই। এই বাজার সংকটে মার খেয়ে ছোট-মাঝারি এমনকী অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পপতিও ধ্বংস হচ্ছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী শিল্প অপরকে কিনে নিচ্ছে, অন্যের সাথে মার্জার ঘটাচ্ছে। একদিনের জাতীয় পুঁজিবাদ জাতীয় গণ্ডি ত্যাগ করে বহুজাতিকে পরিণত হয়েছে, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্য দেশে পুঁজি ইনভেস্ট করে সেখানকার সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার করে যাকে আউটসোর্সিং বলে, নিজের দেশ ও অন্য দেশের বাজার লুটছে। এদের কাছে মুনাফার স্বার্থ ছাড়া 'জাতীয়' বা 'দেশের স্বার্থ' বলে কিছু নেই। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশনালরাও আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার নানা দেশে ব্যাপক পুঁজি ইনভেস্ট করেছে।

এই পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির সংকট কী? আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর আমেরিকা বলল, এক মেরু বিশ্ব, অর্থাৎ আমেরিকাই দুনিয়ার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে আছে। এরপর আমেরিকা গ্লোবালাইজেশন স্কিম নিয়ে এল অন্যান্য দেশের শুল্কের প্রাচীর, বাণিজ্যের প্রাচীর ভেঙে সেই দেশগুলির বাজার গ্রাস করার জন্য। এখন সংবাদ মাধ্যমে দেখবেন, আজ সেই আমেরিকাই বলছে, গ্লোবালাইজেশনের ফলে আমার বাজার অন্যেরা গ্রাস করে নিচ্ছে। এখন বলছে, গ্লোবালাইজেশন চাই না, আমেরিকা ফর আমেরিকানস। আমেরিকান ছেলেদের চাকরি নেই, লক্ষ লক্ষ আমেরিকান বেকার। কারণ সমাজতন্ত্র ধ্বংস করে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চীন আজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়াও সেদিকে এগোচ্ছে। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাপানের সাথে বাজারের দ্বন্দ্ব তো আছেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে প্রবল বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই এতে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ছে। একদিকে বিশ্বের শোষিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে, ফলে বাজারও সংকুচিত হচ্ছে, আর এই সংকুচিত বাজারেরই কে কতটা দখল নেবে এই নিয়েই ট্রেড ওয়ার শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ভাবেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

এই কয়েক বছর আগে আমেরিকা জুড়ে বিরাট আন্দোলন হল। সাত মাস ধরে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট করল।

ওয়াল স্ট্রিট হচ্ছে মার্কিন পুঁজিপতিদের আখড়া। স্লোগান তুলল, ডাউন উইথ ক্যাপিটালিজম-ইম্পিরিয়ালিজম। গ্লোবালাইজেশন ধ্বংস হোক। এই আন্দোলন মার্কিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ফলে আমেরিকা এখন বলছে, আমার দেশে অন্য দেশের পণ্য আমদানি আমি আটকাব। কারণ আমার দেশে শিল্প মরছে, বেকারি বাড়ছে, ছাঁটাই বাড়ছে, জনগণ ক্ষিপ্ত হচ্ছে। মেক্সিকোর বর্ডার আটকে দিয়ে শরণার্থীদের অমানবিক ভাবে বন্দি করে রাখছে। যাতে মেক্সিকোর গরিব মানুষ ঢুকতে না পারে — আমেরিকায় তারা ঢুকছে কাজের জন্য।

ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজিবাদই তো এই সংকট সৃষ্টি করেছে। বাজার অর্থনীতিই তো বাজার সংকট সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজিবাদই তো সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। ভারতকে লুণ্ঠন করেছে কে? সাম্রাজ্যবাদ। এশিয়া-আফ্রিকাকে লুণ্ঠন করেছে কে? সাম্রাজ্যবাদ। সেই সাম্রাজ্যবাদ এসেছে কোথা থেকে? ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদ থেকেই তো! সমাজতন্ত্র কি কোনও দেশ দখল করেছে? লুণ্ঠন করেছে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কে বাধিয়েছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন কে জ্বালিয়েছিল? ইটালিতে, জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল কে? ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদ। সমাজতন্ত্রের সাথে এই পুঁজিবাদের তুলনা চলে?

আজ যে বিশ্বে কোটি কোটি বেকার, কোটি কোটি ছাঁটাই শ্রমিক— কে সৃষ্টি করল? ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদ নয়? ইরাককে, লিবিয়াকে ধ্বংস করল কে? আফগানিস্তানকে ধ্বংস করল কে? সিরিয়াতে যুদ্ধের আগুন জ্বালালো কে? ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ নয়? এসব কে অস্বীকার করতে পারে!

কোথায় আজ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা— যে স্লোগান তারা একদিন তুলেছিল? একদল ফুটপাতে থাকে, আর একদল আকাশচুম্বী প্রাসাদে বাস করে— সাম্য চলে? চটকলের শ্রমিক আর মালিকের সাম্য চলে? টাটার মালিক আর শ্রমিকে সাম্য চলে— যেখানে এমন দুস্তর অর্থনৈতিক বৈষম্য? কোথায় মৈত্রী? দেশে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, বর্ণবিদ্বেষের আগুন তো পুঁজিবাদই জ্বালাচ্ছে। গোটা বিশ্বে উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ— এই হচ্ছে পুঁজিবাদের মৈত্রী! স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতা হচ্ছে, পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের স্বাধীনতা। আর শ্রমিক শ্রেণি, গরিব মানুষ প্রতিবাদ করলে, তাকে লাঠি-গুলি চালিয়ে দমন করার স্বাধীনতা। এই হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদসৃষ্ট সাম্য-মৈত্রী-

স্বাধীনতার আজকের পরিণতি।

মনুষ্যত্বের সংকট সর্বব্যাপী

গোটা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সর্বত্র মনুষ্যত্বের সংকট। আমেরিকায় এর আগে এক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে লাম্পট্যের অভিযোগ ছিল। এখনকার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধেও একাধিক লাম্পট্যের অভিযোগ। এই হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রের নায়কের চরিত্র। আমেরিকায় ব্যাপক নারীধর্ষণ চলে। তারপর দেখুন, হঠাৎ হঠাৎ স্কুলে ঢুকে গুলি চালিয়ে দিচ্ছে, রাস্তায় গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। এইসব বন্দুকবাজ যুবকরা মানসিক ভাবে অসুস্থ। কিন্তু বন্দুকের লাইসেন্স অবাধ। কেন? কারণ, বন্দুক ব্যবসায়ীরা ভোটে ট্রাম্পকে টাকা দিয়েছে।

বিশ্বের উষ্ণায়ন হচ্ছে। ফসিল ফুয়েল থেকে, পেট্রোলিয়াম জ্বালানি থেকে হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বারবার ওয়ার্নিং দিচ্ছে— ওজোন লেয়ার ধ্বংস হচ্ছে, উত্তাপ বাড়ছে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রে জল বাড়ছে। এমন ভাবে জল বাড়ছে, বঙ্গোপসাগর সহ বিভিন্ন সমুদ্র এগিয়ে আসছে একটু একটু করে স্থলভূমিকে গ্রাস করে। একচেটিয়া পুঁজিবাদী মালিকানার ফল এটা। কিন্তু আমেরিকা এতে কর্ণপাত করছে না। কারণ পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ীরাও ট্রাম্পকে ভোটে টাকা দিয়েছে। সব দেশেই তাই। এ দেশেও তাই। পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখে এইসব দলগুলো আর টাকা নেয়। নিজেরাও টাকা কামায়। এ দেশে এমপি, এমএলএ প্রত্যেকের কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স— এ দেশে, বিদেশে তো আছেই। এরাই জনগণের সেবক!

আর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে আনছে পুঁজিবাদ। যে পুঁজিবাদ এক সময় মানবতাবাদের আহ্বান নিয়ে এসেছিল সে আজ মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিচ্ছে। মানুষের সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল বর্বর যুগ অতিক্রম করে যখন সমাজে ন্যায়নীতিবোধ, বিবেক, মূল্যবোধ এসেছিল। এই নিয়ে মনুষ্যত্ব, বিবেক দংশন— আমি এই কাজ করতে পারি না, আমি এটা ভাবতে পারি না, এটা অমানুষের কাজ। আমি তো হাজার হোক মানুষ। আমি না খেয়ে মরতে পারি তবু অমানুষের মতো আচরণ করতে পারি না। এ সব বোধগুলি একদিন ছিল, আজ সেগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এই যে ব্যাপক নারীধর্ষণ হচ্ছে, হত্যা হচ্ছে, কেন হচ্ছে? এমনি এমনি হচ্ছে? শাসক শ্রেণি যুবকদের বিপথে ঠেলে দিয়েছে। তা হলে মনুষ্যত্ব মাথা

তুলে দাঁড়াবে না। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হবে না। তাই মদ খাও, নোংরামি কর, ফুর্তি কর। এইসব ছেলেরাই তো মেয়েদের দেখলে টিটকিরি দেয়, হাত ধরে টানে, অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। ছ'মাসের বাচ্চা মেয়েকে পর্যন্ত ধর্ষণ করছে। পশু জগতেও এ জিনিস পাবেন না। বিবেক মনুষ্যত্ব থাকলে এই সব জিনিস হয়? খালি টাকা কামাও— ছিনতাই করে হোক, তোলা তুলে হোক, সিন্ডিকেট করে হোক, গলা টিপে মেরে হোক। এমনকী বাবা-মা'র গলা টিপে মেরে সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে সন্তান। বাবা-মাকে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। মাতৃত্ব-পিতৃত্ব ধূলায় লুণ্ঠিত। স্বামী-স্ত্রীর জীবন সন্দেহ-অবিশ্বাসে বিষাক্ত। দাম্পত্য জীবনে শান্তি নেই। মনুষ্যত্ব থাকলে বিবেক থাকলে তো শান্তি থাকবে। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-দয়া-মায়া-হৃদয়বৃত্তি সব নষ্ট করে দিয়েছে। মনুষ্যদেহী মনুষ্যত্ববোধহীন এদের কে সৃষ্টি করেছে? ব্যক্তিমালিকানাধীন এই পুঁজিবাদই সৃষ্টি করেছে। গোটা বিশ্বেই আজ এই সংকট। শেক্সপিয়ারের সেই ইউরোপ নেই, মিল্টনের ইউরোপ নেই, বার্কলের ইউরোপ নেই, বেকন স্পিনোজা লক হবস কান্ট ফুয়েরবাক এঁদের ইউরোপ নেই। এমনকি রমাঁ রলাঁ আইনস্টাইন বার্নার্ড শ রাসেলদের সেই ইউরোপও নেই। আমাদের দেশেও রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচাঁদ-সুব্রহ্মনিয়মভারতী-গোপবন্ধু-নজরুল-সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিং— এঁদের স্মৃতি অবলুপ্ত করা হচ্ছে। চর্চার মধ্যেই নেই। সিপিএমও কোনও দিন করেনি। একমাত্র আমরা গুরুত্ব দিয়ে এঁদের চর্চা করে যাচ্ছি। গত ২৯ জুলাই মহান বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিবস চলে গেল, আগামী ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন আসছে। আমরা উদযাপন করছি। এঁদের নিয়ে এইসব দলের কোনও মাথাব্যথা আছে? বিজেপির সাথে তৃণমূল প্রতিযোগিতায় নেমেছে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী নিয়ে। এখন যত দেব-দেবীর জয়ন্তী পালনের প্রতিযোগিতা চলছে, কোন দলের কত ধর্মভক্তি তা প্রমাণের জন্য। সব ভোটের দিকে তাকিয়ে ও মানুষের মধ্যে ধর্মান্ধতা বাড়ানোর জন্য করা হচ্ছে।

পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানাকে উচ্ছেদ করেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্র শোষণমুক্ত সমাজ গড়েছিল

অন্য দিকে দেখুন, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানাধীন যে সমাজতন্ত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল রাশিয়ার মতো একটি অনুন্নত দেশে, সেই সমাজতন্ত্রই ঘোষণা করেছিল বেকার বলে কিছু থাকবে

না, ছাঁটাই বলে কিছু থাকবে না। সেখানে ৭০ বছর ধরে বেকার ছিল না, ছাঁটাই ছিল না। সেই সমাজতান্ত্রিক দেশে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, প্রত্যেকের বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ চালু হয়েছিল। গ্রামে শহরে অসংখ্য হাসপাতাল-ডাক্তার-নার্স, স্কুল-কলেজ-শিক্ষক ছিল। বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিত, জল দিত, জ্বালানি দিত, অল্প পয়সায় বাড়ি ও খাদ্য দিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। আট ঘন্টার জায়গায় সাত ঘন্টা, তারপর ছয় ঘন্টার কাজের দিকে যাচ্ছিল। তারপর ঘোষণা করছিল পাঁচ ঘন্টার দিকে যাবে। বাকি সময় শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ লেখাপড়া করবে, গানবাজনা করবে, নাটক করবে, সিনেমা দেখবে। অসংখ্য লাইব্রেরি, নাট্যশালা, সিনেমা হল করে দিয়েছিল শহরে-গ্রামে। বছরে ১৫ দিন শ্রমিকদের সবেতন ছুটি ছিল। ছুটিতে সমুদ্রের তীরে, পাহাড়ের কোলে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকত তারা। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করেছিল। নারী এবং পুরুষ শ্রমিকদের সমান বেতন ছিল। মেয়েরা সন্তান হলে দু'বছর সবেতন ছুটি পেতেন। তারপর কাজে এলে সন্তানদের ক্রেশে রাখার ব্যবস্থা ছিল। সরকার খাদ্য দিত শিশুদের, পোশাক দিত। ভিক্ষাবৃত্তি, নারীদেহ বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া সমস্ত ছাত্র-যুবকদের বিনা পয়সায় খেলার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছিল। যার জন্য অলিম্পিকে শীর্ষ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ডাক্তার-শিক্ষক-অধ্যাপক-সাহিত্যিক-শিল্পী-বৈজ্ঞানিক সকলের জীবন-জীবিকার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিল সরকার।

বিজ্ঞানে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বিশ্বে শীর্ষ স্থান দখল করেছিল। অনেকে নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াই প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় চাষি শ্রমিক (বুদ্ধিজীবীরাও শ্রমিক) ছাড়া কেউ ভোট দিতে পারত না, ভোটে দাঁড়াতেও পারত না। নির্বাচিত প্রার্থী কাজের রিপোর্ট দিত, সন্তোষজনক না হলে ভোটাররা তাদের ফিরিয়ে নিতে পারত। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় আদালতে কোনও ব্যয় কাউকে দিতে হত না। আদালতের ব্যয় সরকার বহন করত।

বরেণ্য মনীষীরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দিত করেছিলেন

এসব দেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তীর্থস্থান দেখে এসেছি'। রবীন্দ্রনাথ কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন, 'মানবের নব যুগের তপোবন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। আশা এবং আনন্দ খুঁজে পেয়েছি, ইতিহাসে এর আগে কোথাও এমন খুঁজে পাইনি।' আর একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন,

'মানবসভ্যতার বুকের পাঁজর থেকে শক্তিশেলের মতো যে লোভ, তাকে তুলে ফেলার চেষ্টা করছে। আশা করি এরা সফল হবে'। রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রমাঁ রলাঁ, আর এক জন বরেণ্য চিন্তাবিদ সে যুগের। তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যদি ধ্বংস হয়, সোভিয়েতের শ্রমিক শ্রেণি শুধু ক্রীতদাস হবে না, মানবসভ্যতা কয়েক যুগ অন্ধকারে নেমে যাবে। বার্নার্ড শ বলেছেন, গণতন্ত্র আর স্বাধীনতা যদি পেতে চাও সোভিয়েত রাশিয়ায় যাও, যেখানে স্ট্যালিন আছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সুভাষ বোসের উক্তি কী? বলেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর অবদান সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র এবং সর্বহারা সংস্কৃতি'। বিপ্লবী বারীন ঘোষকে সুভাষ বোস লিখেছেন, 'আমাদেরও লক্ষ্য সমাজতন্ত্র, পরে কমিউনিজম'। ভগৎ সিং-ও ফাঁসিতে যাওয়ার আগে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। এইসব বরেণ্য মনীষী ও বিপ্লবীরা কী দেখে সমাজতন্ত্রকে এভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আজকের ব্যক্তিপুঁজির পূজারি বুদ্ধিজীবীরা কি ভেবে দেখবেন? সোভিয়েত সমাজতন্ত্র দেখে এত দূর উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেদিনের বড় মানুষরা।

কেন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটল?

কিন্তু পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লব সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। এটা বেদনাদায়ক ঘটনা। আবার এই বিপর্যয় যে ঘটতে পারে তা মার্কস বলে গেছেন, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-শিবদাস ঘোষ সকলেই বলেছেন। কারণ একটা দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব হলেই দেশের সব মানুষ মার্কসবাদী হয়ে যায় না, কমিউনিস্ট হয় না। মানুষের মধ্যে পুরনো সমাজের সংস্কার, প্রবৃত্তি, মানসিকতা থেকে যায়। যেমন কোন সুদূর অতীতে মাতৃশাসিত সমাজ পাল্টে পুরুষশাসিত সমাজ এসেছে, কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবে গণতন্ত্রের স্লোগান, নারীর সমান অধিকার এসব বড় বড় ঘোষণা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব যায়নি। আমাদের দেশের কয়েক হাজার বছরের পুরনো বর্ণবিদ্বেষের অবসান আজও হয়নি, সতীদাহ প্রথার আকর্ষণ কমেনি, হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ সম্মানজনক ভাবে চালু হয়নি। এইসব সংস্কার রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে থাকে। রাশিয়ায় কোটি কোটি মানুষ বিপ্লবকে সমর্থন করেছে, সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছে। তাদের কমিউনিজমের প্রতি আবেগ ছিল। আবেগ এক জিনিস, চিন্তা-ভাবনা, রুচিতে সংস্কৃতিতে মার্কসবাদকে গ্রহণ করা ভিন্ন

জিনিস। এটাই কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালে বুঝেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিবাদ ফবাসি বিপ্লবের যুগে প্রগতিশীল ছিল। তখন তা মানুষকে চরিত্র দিয়েছে, ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার পর ব্যক্তিবাদও প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে। তা ব্যক্তিকে আত্মসর্বস্ব ও সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করেছে। যে জন্য আমাদের পার্টি গঠনের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, আমাদের পার্টি-নেতাদের শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়লে হবে না, চিন্তা-ভাবনা-আচার-আচরণে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে, সন্তান সম্পর্কে, জীবনের সমস্ত প্রশ্নে ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। রাশিয়ায় যখন বিপ্লব হয়, তখনও রাশিয়ায় ব্যক্তিবাদ প্রগতিশীল ছিল। কারণ রাশিয়ায় বিপ্লবের সময় পুঁজিবাদ শক্তিশালী হয়নি, শুধুমাত্র ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে পুঁজিবাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করায় লেনিন বলেছিলেন, সেই অর্থে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজ সমাজতন্ত্র কার্যকর করবে। চীনের বিপ্লবও ছিল শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ফলে বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ— ব্যক্তিবাদ ভিত্তিক চরিত্রের এই মান দিয়ে এই দুই দেশে বিপ্লবের কাজ হয়েছে। আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের সময় যেমন ছিল— স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থ প্রধান, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ গৌণ। এইসব কথায় কাজ দিত। এটা দেখিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, যতক্ষণ বিপ্লবের লড়াই হচ্ছে, যতক্ষণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব পুনর্গঠন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ— এটা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ার পর, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ অনেকটা নির্মূল হওয়ার পরও উপরিকাঠামোতে, সংস্কৃতি জগতে, চিন্তা-ভাবনা-অভ্যাস-আচরণে, পারিবারিক সম্পর্কে, চাওয়া-পাওয়ার জগতে ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ থেকে যায়। এই ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের জন্ম দিয়েছে। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ সমাজজীবনে, প্রশাসনে ও দলের মধ্যে নানা বুর্জোয়া ভাইসেস জন্ম দিয়েছিল, যার ফলে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর স্তরে স্তরে সূক্ষ্মভাবে ক্ষয় ধরেছিল। অন্য দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব বিপুল অগ্রগতি বিভিন্ন স্তরেব নেতা-কর্মী ও জনগণের মধ্যে প্রবল আত্মসন্তুষ্টির মানসিকতা গড়ে তোলে। যার ফলে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শগত চর্চাকে অবহেলা করে এবং যার

পরিণতিতে বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব বাড়ে। যতক্ষণ মহান স্ট্যালিন বেঁচেছিলেন এই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ ও বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা তুলতে পারেনি। শক্তি সঞ্চয় করছিল। স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে ১৯৫২ সালে এই বিপদ বুঝেছিলেন, তাঁর শেষ ভাষণে তা বোঝা যায়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি বেঁচে ছিলেন না। মাও সে তুং-ও শেষ জীবনে এই বিপদ বুঝে লড়াই করলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ, অসুস্থ। এই অসুস্থ মানুষই স্লোগান তুলেছিলেন— 'বম্বার্ড দি হেডকোয়ার্টার'। এক সময়ে যারা তাঁর সাথী ছিল, লিউ শাও চি, লিন পিয়াও, তেং শিয়াও পিং— এরাই ক্ষমতাসীন হয়ে পুঁজিবাদের দিকে এগোচ্ছিল। মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আহ্বান জানালেন পুঁজিবাদী আক্রমণকে রোখবার জন্য। কিন্তু পারেননি। কারণ মৃত্যু এসে তাঁর প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করল। বিপ্লবের পরও পরাজিত পুঁজিবাদের গোপন ষড়যন্ত্র ছিলই, আর তাকে মদত দিচ্ছিল বাইরের সাম্রাজ্যবাদীরা। এর সাথে যুক্ত হল জনগণের মানসিকতায় সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ ও নানা বুর্জোয়া অভ্যাস-আচরণ। ফলে সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে পরাজিত পুঁজিবাদ ও বাইরের সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের ষড়যন্ত্রে এবং জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের প্রভাব ও বুর্জোয়া অভ্যাস-আচরণের ফলে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হল। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এটা তো প্রমাণিত, একমাত্র সমাজতন্ত্রই নতুন মুক্তির আলো দিতে পারে। দিয়েছে। সমাজতন্ত্রে কেন সংকট এল, তা বুঝে আগামী দিনে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব যারা করবে, তারা এই প্রতিবিপ্লব থেকে যথাযথ শিক্ষা নিয়ে সতর্ক থেকেই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ থাকলে বেকারত্ব বাড়বে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বাড়বে। স্নেহ-মমতা ধ্বংস হবে। নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ বাড়বে। যুদ্ধ বিগ্রহ বাড়বে। জাতিগত বিদ্বেষ বাড়বে। এটাই কি চলবে? এর হাত থেকে বাঁচতে হলে একমাত্র পথ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আপনাদের ইতিহাসের পাতা পড়তে বলি। ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রত্যেকটি ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত বছর লড়াই করতে হয়েছে। একদিন-দু'দিনে হয়নি। এগুলির যাঁরা প্রবর্তক, তাঁরা দু'জন-পাঁচজন নিয়েই শুরু করেছিলেন। এই হচ্ছে ইতিহাস। নবজাগরণ থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত সাড়ে তিনশো বছর লেগেছে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। আর দাসপ্রথা, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ— এই সব ব্যবস্থাই তো মালিকানা ভিত্তিক, কয়েক হাজার

বছর ধরে চলেছে। তাকে উচ্ছেদ করার জন্য সামাজিক মালিকানা— সমাজতান্ত্রিক মালিকানা রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল, তার মেয়াদ মাত্র ৭০ বছর ছিল। কয়েক হাজার বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রূপের শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে ৭০ বছরের সমাজতন্ত্র। কতটুকু সময়! কিন্তু এর মধ্যেই দেখিয়ে গেছে, নতুন সভ্যতা কাকে বলে, কীভাবে মানবমুক্তি সম্ভব, এটাই বাঁচার একমাত্র রাস্তা। ফলে এখানে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। হতাশাগ্রস্ত হয়ে কী করবেন? বাঁচবেন এই সংকটের হাত থেকে?

ভোটের মোহ ত্যাগ করে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার জন্য বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

ফলে আপনাদের কাছে আমার আবেদন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা স্মরণ করুন— নির্বাচনের পথে নয়, একমাত্র বিপ্লবই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাতে পারে। তার জন্য প্রস্তুতি চাই। আমরা ভোটে নামি, কারণ নামতে বাধ্য হই। লেনিনের শিক্ষা— যতদিন মানুষ ভোটে যাবে, বিপ্লবীদেরও যেতে হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য যে, ভোটে কাজ হয় না। আর পার্লামেন্ট অ্যাসেম্বলিতে থাকলে, জিতলে, গরিব মানুষের হয়ে প্রতিবাদ করবে। কমরেড শিবদাস ঘোষও এই শিক্ষাই দিয়েছেন। আমাদের দলের দিকে তাকিয়ে দেখুন— এই বৃষ্টিতে বসে আছেন আপনারা এত হাজার হাজার মানুষ। আপনারা চাঁদা দিয়ে এই মিটিংয়ের প্রস্তুতি নিয়েছেন। আপনারাই পয়সা খরচ করে এই মিটিংয়ে এসেছেন। এই বৃষ্টিতে ভিজছেন কেন? এই শক্তি কোথা থেকে পেয়েছেন? এই দলের শক্তি কে দিয়েছে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। এই হচ্ছে শক্তি। এই শক্তির ভিত্তিতে চাই গ্রামে গ্রামে গরিব মানুষকে নিয়ে গণকমিটি গঠন। আপনারা গণকমিটি গঠন করুন। কৃষক-খেতমজুর সংগঠন গড়ে তুলুন। শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলুন বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে। ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন গড়ে তুলুন। ট্রেনে বাসে রাস্তায়, যে কোনও জায়গায় অন্যায় দেখবেন, একা দাঁড়িয়ে হলেও প্রতিবাদ করবেন। আর সর্বত্র রাজনীতি আলোচনা করুন। দলের শ্রেণি চরিত্র বুঝুন ও বোঝান। কেউ বলুক না বলুক নানা দাবিতে গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলুন। ঘরে বসে অদৃষ্টকে দায়ী করলে কিছু হবে না। নিজেদেরই পায়ে দাঁড়িয়ে শোষিত শ্রেণির স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতি নিয়ে লড়ুন। এমনিতেই তো তিল তিল করে মরছেন,

লড়াই করেই মরুন। যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ুন, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে, বৃদ্ধ ও নারীদের সম্মান রক্ষার্থে রুখে দাঁড়াবে। আবার যুবকদের কাছে নিয়ে যান সেই সুভাষচন্দ্রের চরিত্র, ক্ষুদিরামের চরিত্র, ভগৎ সিংয়ের চরিত্র, প্রীতিলতার চরিত্র, বিদ্যাসাগরের চরিত্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্রনাথের আহ্বান। আমরা এই জয়ন্তীগুলি করি কেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, এঁদের থেকে শিক্ষা না নিলে তোমরা কমিউনিস্ট হতে পারবে না। এঁরাই বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। এঁদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোও। অগ্রগতির পথে আর এক ধাপ এগোলে তখন উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র পাবে। আমরা যৌবনকে জাগাতে চাই, মনুষ্যত্বকে জাগাতে চাই, যারা লড়বে এই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে।

পুঁজিবাদ নরখাদকে পরিণত হয়েছে

আর শিশুদের রক্ষা করুন। আমি কমরেডদেরও বলেছি, আপনাদেরও বলছি। ক্লাস ফোর ফাইভ সিক্সের ছেলেমেয়েরা মদ খাচ্ছে, ভাবতে পারেন! আপনাদের ছোট বয়সে এ সব ছিল? টিভিতে মোবাইলে নোংরা ব্লু-ফিল্ম দেখে। নোংরা যৌনতার শিকার হচ্ছে বাচ্চাগুলো। আমি আমাদের কর্মীদের বলেছি, বার বার তাদের বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়েছি, আপনারা যারা আছেন, আপনাদেরও বলব, রবিবার ছুটির দিন সকালবেলা এক ঘন্টা সময় ব্যয় করুন। পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে খেলাধুলা করান, প্যারেড করান, ওদের বিদ্যাসাগরকে চেনান, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে চেনান। সুভাষচন্দ্রকে চেনান। ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামকে চেনান। বড় মানুষদের চেনান। ওদের মধ্যে বিবেক জাগান, মনুষ্যত্ব জাগান। এই সভ্যতা বিপন্ন। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করছে। আমরা ইতিহাসে পড়েছিলাম, একটা যুগ ছিল, যখন মানুষে মানুষ খেত— ক্যানিবালিজম বলত। এই পুঁজিবাদ প্রত্যক্ষভাবে মানুষ খাচ্ছে না, কিন্তু মানুষকে হত্যা করছে। অনাহারে মারছে, বিনা চিকিৎসায় মারছে। আত্মহত্যার দিকে ঠেলছে। আর এই পুঁজিবাদ মনুষ্যত্বকে মারছে। মডার্ন ক্যাপিটালিজম মডার্ন ক্যানিবালিজমে পরিণত হয়েছে। এই এক ধরনের নরঘাতক মানব সভ্যতার ধ্বংসকারী। এর বিরুদ্ধে আপনারা মাথা তুলে দাঁড়ান।

সিপিএম-এর রাজনীতিই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানের জমি তৈরি করে দিয়েছে

এই উদ্দেশ্য নিয়েই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দল গড়ে তুলেছেন কঠিন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে। আমাদের বলেছেন, মানুষকে জয় করবে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, শালীনতা দিয়ে। গায়ের জোর নয়, দাপট নয়। এই গায়ের জোর, দাপট, কণ্ঠরোধ, টাকা দিয়ে পার্টি করানো, সুযোগ সুরিধা দিয়ে পার্টি করানো— আমাদের দলে এলে চাকরি পাবে, লাইসেন্স পাবে, পারমিট পাবে, প্রোমোশন পাবে, ভাল জায়গায় ট্রান্সফার পাবে, তোলাবাজি করতে পারবে, সিন্ডিকেটবাজি করতে পারবে— এই করে সিপিএম তেত্রিশ বছর শাসন করেছে। বামপন্থার মর্যাদা নষ্ট করেছে। যার সুযোগ নিয়ে আজ বিজেপি ঢুকছে, আরএসএস ঢুকছে। ১৯৬৯ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ওয়ার্নিংই দিয়েছিলেন। এরকম প্রজ্ঞা তাঁর ছিল— বলেছিলেন, তখন নাম ছিল জনসংঘ, আজ বিজেপি— বলেছিলেন, জনসংঘ ওৎ পেতে আছে। তোমরা বামপন্থাকে কলঙ্কিত করছ। এর সুযোগ নিয়ে আরএসএস, জনসংঘ ঢুকবে। ঘটলোও তাই। অন্যদিকে তৃণমূলবিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠছে। কাগজ একসময় হাওয়া তুলেছিল— তৃণমূলকে চাই। পাগলের মতো ছুটেছিল সকলে। এখন তৃণমূলকে ঠেকাতে হলে সিপিএম নয়, বিজেপি চাই— এই ধ্বনি একদল তুলছে। অতীতে এই বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো ক্ষমতাবান মানুষ জায়গা করতে পারেননি। তখন ছিল সুভাষ বোসদের বিপ্লববাদের জোয়ার। আর আজ কী দুরবস্থা! রাজনীতি না বুঝে সাম্প্রদায়িক প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে, টাকা ও সুরিধার লোভে ও তৃণমূল বিরোধিতায় একদল বিজেপির দিকে ঝুঁকছে। একবার ভেবেও দেখছে না সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি কী করে যাচ্ছে। এ ভাবে রাজনীতি ও দলের শ্রেণি চরিত্র না বুঝে সাধারণ মানুষ বারবার নিজেদের পায়েই নিজেরা কুড়ুল মারছেন।

আমরা সিপিএম-সিপিআই নেতাদের বলেছিলাম, আপনারা ভোটের হিসাব করছেন। অথচ আজ একচেটিয়া পুঁজি বনাম একচেটিয়া পুঁজির দ্বন্দ্ব চলছে। ওদেরও তো বাজার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে— সর্বভারতীয় পুঁজি আঞ্চলিক পুঁজির দ্বন্দ্ব চলছে। বিভিন্ন সর্বভারতীয় বুর্জোয়া দলের মধ্যে এরং সর্বভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির দল ও আঞ্চলিক পুঁজিবাদী দলের দ্বন্দ্ব চলছে। এই যে বুর্জোয়াদের ঐক্য নেই, প্রবল দ্বন্দ্ব চলছে— এই হচ্ছে একটা সুযোগ, শ্রমিক-

কৃষক, ছাত্র-যুবদের আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করার। এই পথে আসুন। সিপিএমের কাছে আমাদের এই আহ্বান ছিল। তাঁরা এই আন্দোলনে এলেন না। তাঁরা বামপন্থাকে কলঙ্কিত করে প্রথমে তৃণমূলকে জায়গা করে দিলেন, এখন তো শুনছি, তাঁদের দলের রাজ্য সম্পাদক বলছেন, তাঁদের দলের একদল তৃণমূলে যাচ্ছে বিজেপি বিরোধিতার জন্য, আর এক দল তৃণমূল বিরোধিতার জন্য বিজেপিতে যাচ্ছে! এমন মার্কসবাদ শিখিয়েছেন, এমন বামপন্থা শিখিয়েছেন, দলের লোক চলে যাচ্ছে তৃণমূলে আর বিজেপিতে! ৩৪ বছর শাসন করে এমন শক্তি সঞ্চয় করেছেন! কী রকম পার্টি! কোনও আদর্শের চর্চা আছে? কোনও সংগ্রাম আছে? কোনও নীতি আছে? এ সংকট হল কেন? অনুসন্ধান করুন। করলেই কমরেড শিবদাসের কথায় আসতে হবে। এই দল যথার্থ মার্কসবাদের চর্চা করেনি। মার্কসবাদের নামে ভ্রান্ত চিন্তা নিয়ে চলেছে। ১৯৭৭-এ সরকার করল। কার সাথে হাত মিলিয়ে? জনতা পার্টির সাথে। যে জনতা পার্টির সাথে জনসংঘ ছিল, আরএসএস ছিল। সিপিএম তার সাথে ঐক্য করেছে। '৭৭ সালে মোরারজি দেশাই যখন প্রধানমন্ত্রী, বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে ওরা সাহায্য করেনি? ভিপি সিং যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তাঁকে সমর্থন করছে বিজেপি এবং সিপিএম হাতে হাত মিলিয়ে। এই কলকাতা ময়দানে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং জ্যোতি বসু একসঙ্গে মিটিং করে গেছেন। বিজেপির সমর্থন নিয়ে সিপিএম কলকাতা কর্পোরেশন চালিয়েছে। এইভাবে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেনি? কোনও দিন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছে? তাদের কর্মীদের মন তৈরি করেছে? এক সময় তো রিফিউজি এলাকায় তাঁরা খুব ভোট পেতেন, সেই এলাকায় আজ আরএসএস ঢুকছে কী করে? কারণ তাদের সাম্প্রদায়িতা মুক্ত করেননি।

আমি আবারও বলছি, পশ্চিমবাংলা, অবিভক্ত বাংলা ভারতের গৌরব ছিল। নবজাগরণের এখানে সূচনা। স্বদেশি আন্দোলনে বিপ্লববাদের এখানেই সূচনা। গোটা ভারতবর্ষ অবিভক্ত বাংলার দিকে তাকিয়ে থাকত। তারই খণ্ডিত অংশ এই পশ্চিমবাংলা। এই অবিভক্ত বাংলার ঐতিহ্য নিয়েই বাংলাদেশে, যে বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান, তারা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে লড়াই করে স্বাধীন বাংলা কায়েম করেছে। সেই গৌরবের অধিকারী তারা। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের, হিন্দুরাষ্ট্রের যারা স্লোগান তোলে, তাদের সুভাষচন্দ্রের ভাষায় দেশের শত্রু গণ্য করা দরকার। তাদের বলা দরকার, নেপাল তো হিন্দুরাষ্ট্র, নেপালকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই দাবি তুললে নেপালিরা

তাড়া করবে। আরবে সৌদি আরব, জর্ডন, ইরাক, ইরান সব তো মুসলিম রাষ্ট্র। এক দেশ হচ্ছে? ওরা তো পরস্পরের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে যুদ্ধও করছে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হয়? বিজেপি-আরএসএস গো-মাতার জিগির তুলে গো-হত্যা বন্ধ করাচ্ছে, নিরীহ গরির মানুষকে গো-হত্যাকারীর তকমা লাগিয়ে খুন করছে। আমাদের কথা বাদ দিলাম। এই সম্পর্কে বিবেকানন্দের কথা শুনুন। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' নবম খণ্ডে পাবেন। তিনি বেলুড় মঠে শিষ্যদের নিয়ে বসেছিলেন। তখন গো-রক্ষার জন্য তাঁর কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল কয়েকজন। তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন, মধ্যপ্রদেশে কয়েক লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে, তাদের জন্য কী করছ? ওরা উত্তর দিল, এই মানুষগুলো নিজেদের পাপে মারা যাচ্ছে, ফলে ওদের জন্য করার কিছু নেই। বিবেকানন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, গরুও তাহলে পাপে মারা যাচ্ছে। "প্রচারক (একটু অপ্রতিভ হইয়া) ঃ হ্যাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু শাস্ত্র যে বলে— গোরু আমাদের মাতা। বিবেকানন্দ (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ, গোরু আমাদের যে মা, বিলক্ষণ বুঝেছি। তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবে?" তারপর বিবেকানন্দ শিষ্যদের গভীর দুঃখে ক্ষোভে বললেন, "তোদের হিন্দু ধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?" এই বিবেকানন্দের কী শাস্তি বিধান করবেন আরএসএস, বিজেপি নেতৃবৃন্দ!

বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থে অন্য দলগুলি সর্বহারা শ্রেণির দল এস ইউ সি আই (সি)-র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেও আমাদের অগ্রগতি রুখতে পারেনি

ফলে গোটা দেশে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি। আমরা সিপিএম-সিপিআইকে আজকের এই মিটিং থেকেও আবেদন জানাচ্ছি, নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতি আজ আপনাদের এই জায়গায় এনেছে। ১৯৫২ সালে, '৬০ সালে, '৬৬ সালে আপনাদের মানুষ সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত। আপনাদের কর্মীদের একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। আজ সেই মান কোথায় চলে গেছে! সিপিএমকে বলছি, আপনারা তো আমাদের দলের ১৬১ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছেন। আজও আমাদের দল দাঁড়িয়ে আছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের দলের দুটি কর্মীর চোখ চলে গেছে। এই সেদিনও রাজভবনের সামনে আমাদের কর্মীদের তৃণমূল সরকার কীভাবে মারল।

আমাদের একটাও এমএলএ-এমপি নেই। আমাদের দল কি দুর্বল হচ্ছে? এ-ও আপনাদের জানাই, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা জিতেছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মৈপীঠে। আমাদের বিরুদ্ধে সিপিএম-তৃণমূল ঐক্য হয়ে গেল। নদীয়ার বারুইপাড়ায় আমাদের বিরুদ্ধে সিপিএম-তৃণমূল ঐক্য হল। আমরা সিপিএম নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, এটা কী হচ্ছে? ওরা উত্তর দেয়নি। এমনকী গ্রামের একটা সিটে আমরা জিততে পারি, এই আশঙ্কায় আমাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল-সিপিএম-বিজেপি-র ঐক্য হয়ে গেল বিভিন্ন জেলায়। এই সদ্য হুগলির হেস্টিংস জুটমিলে কো-অপারেটিভে নির্বাচন হল। সেখানে সিপিএম-তৃণমূল-বিজেপি ঐক্য হল আমাদের বিরুদ্ধে। এই হচ্ছে শ্রেণি-ঐক্য। বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সকলের চোখে দুশমন। এ দলের এমএলএ-এমপি নেই, খবরের কাগজের প্রচার নেই। এই বৃষ্টিভেজা মাঠ। কত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন। বৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার মানুষ শুনছেন। বাচ্চা কোলে নিয়ে মায়েরা শুনছেন। কালকের কাগজে রেডিও টিভিতে বিশেষ কিছু পাবেন না। পেলেও কোনও কোণে হয়ত একটু পেতে পারেন। কিন্তু এভাবে আমাদের আটকাতে পারছে? কোনও বিপ্লবী দলকে আটকাতে পারে? ভারতের ২৩টি রাজ্যে আজ স্মরণদিবস উদযাপিত হচ্ছে। বহু সৎ যুবক ছাত্রছাত্রী শ্রমিক কৃষক মহিলা মধ্যবিত্ত আমরা পাচ্ছি। কীসের জোরে? মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার জোরে। আমাদের দল এগোবে। এই বাংলাকে আবার জাগাতে হবে। এ দেশের যৌবনকে জাগাতে হবে। গোটা ভারতবর্ষকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই দলগুলো। পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদ একদিকে, আর এক দিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ। যে কথা বলেছি, হয় জীবন, না হয় মৃত্যু। এর মাঝখানে আর কিছু নেই। পুঁজিবাদ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। ধ্বংস অনিবার্য। বাঁচাতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্র— যে দেবে শোষণমুক্ত নতুন সমাজ, নতুন জীবন যৌবন। পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার শপথই আমাদের নিতে হবে। এ কথা বলেই আমি আজ শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ
সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ